মনোজ বসু

শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীচরণেষু—

কাহিনী-সূচি

একদা নিশীথ কালে

টং—

দেয়ালঘড়িতে সাড়ে ন-টা। এখনও অন্তত আড়াই ঘণ্টা। ঘণ্টা-আড়াই পরে বাবার ঘরের আলো নিববে, নীলাদ্রির হাতের পেনাল-কোড বইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠবে তাকের উপর। তারপর আঁধারে আঁধারে বাবার বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে···। কিন্তু থাক এখন সে-সব ; সে তো বারোটার আগে কোনক্রমে নয়—পৃথিবী লয় হয়ে গেলেও নয়।

রোয়াকের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কুয়াশামগ্ন ম্লান জ্যোৎস্না। নীলাদ্রি বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড় অবধি বার-দুই পায়চারি করল। লোক-চলাচল নেই। আর আশ্চর্য,—এ কি অভাবিত কাণ্ড—বাবার উপরের ঘরে আলো তো জ্বলছে না! ব্যাপারটা কি তা হলে? রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে অশোক-কাকাদের বাড়ির গান ও খোলের আওয়াজ আসছে। সংকীর্তন এখনও উত্তাল বেগে চলেছে। মা গেছেন, ইদানীং প্রায় রোজই গিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নামামৃত পান করে করে আসেন। কিন্তু বাড়ির মধ্যে বয়স যাঁর সবচেয়ে বেশি, ভগবৎ-পদে অচলা মতি থাকা একান্তভাবে যাঁর আবশ্যক, তিনি কিছুতে এক-পা নড়বেন না, গান শুনলে তাঁর মাথা ধরে—তা সে যে-গানই হোক। বরদা তাই ঘরে বসে এই সময়টা মক্কেলের কাগজ-পত্র দেখেন। কিন্তু আজ এ হল কি? অশোক-কাকা সন্ধ্যার সময় একবার এসেছিলেন, তিনিই টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এই অঘটন ঘটালেন নাকি? বলা যায় না, সংসারে তো কত আশ্চর্য ব্যাপারই নিয়ত ঘটছে।

অতএব নীলাদ্রি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। তাই-ই বটে! বাবার ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো। আচ্ছা, হঠাৎ যদি দরজা খুলে যায়—এবং ছ-ফুট সুদীর্ঘ সেই দেহ-ছায়া চোখের সামনে উদয় হয়—

নীলে!

আজ্ঞে, বই আনতে যাচ্ছি।

তা বুঝেছি। বইয়ের পাখনা বেরিয়েছে—যখন-তখন উপরে উড়ে আসে। বলি, এগজামিনের তারিখটা মনে আছে তো? গেল-

এগজামিনে নিজের পাখা বেরিয়েছিল, হস্টেল খুঁজে শ্রীমানের পাত্তা মেলে না। হস্টেল ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম তো এবার বই উড়তে আরম্ভ করেছে।

বাদাম-গাছের ফাঁক দিয়ে দরদালানে টুকরো-টুকরো অনেক জ্যোৎস্না পড়েছে। এই জ্যোৎস্না-রাত্রি লোকে পেনাল-কোড মুখস্থ করে কাটায়! গভীর নিশ্বাস ফেলে নীলাদ্রি শোবার ঘরে ঢুকল। সেখানে আরও মহা মারাত্মক ব্যাপার···দেখ, দেখ, এই জ্যোৎস্না-রাত্রি কোন কোন লোক নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাটায়!

উমা ঘুমুচ্ছে। নীলাদ্রির পড়া শেষ না-হওয়া অবধি শাশুড়ি এই ঘরে বউ আগলে থাকেন, আজ তিনি নেই, কেউ নেই—চারিদিকে চুপ-চাপ,—পাতলা সবুজ লেপ মুড়ি দিয়ে চোখের দু-জোড়া পাপড়ি মুদিত করে উমারাণী ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ভান নয়—সত্যকার ঘুম! শিয়রের খানিকটা দূরে একটা অনুজ্জ্বল দীপ। নীলাদ্রি ফিসফিস করে ডাকল, উমা—উমারাণী!

ঘুম পেলে উমা আর এক মানুষ। সে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটা টেনে আরও আঁটসাঁট হয়ে শুল। হাতের সোনার চুড়ি ঝিনমিন করে বেজে উঠল। নীলাদ্রি এক টানে লেপ সরিয়ে মুখের কাপড় টেনে ফেলতেই—

কে? কে? কে রে?

এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই অন্ধকার ঘর থেকে এল, কি হয়েছে বউমা?

সর্বনাশ, স্বয়ং বরদাকান্ত। বরদা ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন,

আমি আসছি। কোন ভয় নেই বউমা, আমি আসছি।···দুত্তোর, আমার খড়ম গেল কোথায় ?

উমা উঠে বসল। ঘুম উড়ে গেছে। পাংশুমুখে নীলাদ্রি পালাবার পথ খোঁজে। পথ একটি মাত্র, দালানের ভিতর দিয়ে। সেই পথেই খট-খট করে খড়ম দ্রুতবেগে আসছে। নীলাদ্রি ব্যাকুল হয়ে
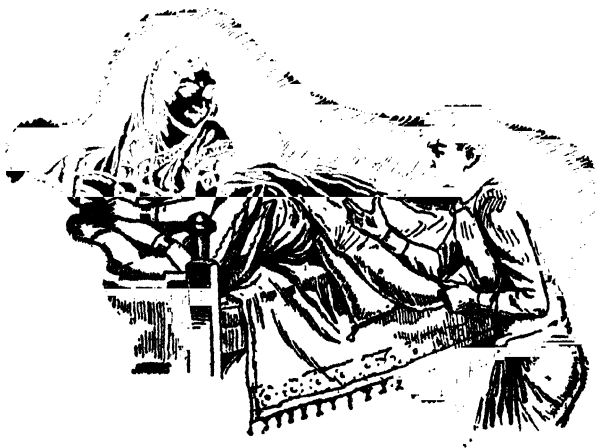
—শিগগির বল, যে একটা বেড়াল

বলল, উমা, বল যে স্বপ্ন দেখছিলে···কিছু নয়। ঐ এসে পড়লেন যে! শিগগিব বল যে একটা বেড়াল—এখানে ওঁর আসতে হবে না—

উমা বলতে গেল, কিন্তু গলা কাঠ হয়ে গেছে, শব্দ বেরোয় না। চৌকাঠের কাছাকাছি খড়মের আওয়াজ প্রত্যাসন্ন। বিছানার ওধারে

পড়ে আছে পাশ-বালিশ—এক মুহূর্ত মাত্র—নীলাদ্রি চক্ষের পলকে সেই বালিশের পাশে গুটিসুটি হয়ে পড়ল, গায়ের উপর আগাগোড়া লেপ চাপিয়ে দিল।

বরদা ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

উমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। আর, শ্বশুরের সামনে তার একটুও ভয় করে না। বলল, স্বপ্নে দেখলাম, চোর এসেছে—

বরদা রাগে ফেটে পড়লেন।

সব দোষ তোমার শাশুড়ির। এখনও তিনি কীর্তন শুনছেন, পুণ্যির বস্তা বয়ে আনবেন। ঘরে এক ফোঁটা বউ, একলাটি···দরজা খোলা—চোর তো আসবেই—

মৃদু হেসে উমা বলল, সত্যি সত্যি আসে নি বাবা। স্বপ্ন দেখলাম। তারপর জেগে উঠে দেখি, চোর নয়—বেড়াল।

কিন্তু বরদার রাগ পড়ে না। বললেন, আসে নি, আসতে পারত। গিন্নির আক্কেলটা কি, বল দেখি।

উমা বলল, এবারে দরজা দিয়ে শোব। মা ফিরে এলে তখন খুলে দেব। আমার ভয় করবে না—আপনি যান বাবা। ঘুমুচ্ছিলেন—মিছিমিছি জাগিয়ে দিলাম।

কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয়?

দেয়ালের ধারে একটা জলচৌকি ছিল; সেটা টেনে নিয়ে বরদা বেশ এঁটেসেটে বসলেন।

বলতে লাগলেন, ঘুম না হাতী। শরীরটা খারাপ লাগছিল, তাই আলো নিবিয়ে একটু চোখ বুঁজেছি—সাক্ষির জবানবন্দিগুলো অমনি কিলবিল করে যেন মাথার মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। আজকের শেষ-

কাছারিতে যে মামলাটা হল, সে এক যাচ্ছে-তাই ব্যাপার। বোসো—চুরুট নিয়ে আসি, তারপর বসে গল্প করব।*

ববদা বেরিয়ে যেতে নীলাদ্রি এক টানে লেপ ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তোমার দোষ।

বিস্ময়ে চোখ বড করে উমা বলল, আমার ?

এক-শ বার। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন ?

উমা বলল, বা রে! আমি কি জানি, যে তুমি ? আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম।

অধীর কণ্ঠে নীলাদ্রি বলল, কেন ঘুমোও ? সে-ই তো দোষ।

আর নিজে চোরের মতো এসে মুখের কাপড টানবেন, সে কিছু দোষ হয় না!

দোষই বটে, উমারাণী! নীলাদ্রিব স্বর ভাবি হয়ে উঠল, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, এই তাব শাস্তি হচ্ছে।

রাগে রাগে সে ঘর থেকে বেরুল। আবাব তখনই ফিবে আসতে হল। উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। এবাবে বরদার ঘবেব দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, সামনেব দিকে মুখ কবে তিনি মোজা পরছেন। এমন সময় মাছি উডে গেলেও তাঁর নজর এডায় না।

নিশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে নীলাদ্রি বলতে লাগল, তোমার কোন ক্ষতি হত না উমা। আমি একটা বার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে যেতাম। বাবাকে ডেকে এ দুর্ভোগ কেন ঘটালে ?

কিন্তু উমারাণীর অনুতাপ নেই। বরঞ্চ মনে হয়, অবস্থাটা সে উপভোগ করছে, যেন সে টিপিটিপি হাসছে। ঘাড নেডে অপরূপ ভঙ্গিমা কবে বলল, ঘুমুই, আব মবে থাকি—চোখের দেখা দেখতে

কিসে আটকায়, শুনি? দুর্ভোগ তো ভারি! নিজে লেপের তলে দিব্যি আরাম করে আছেন, আমি এদিকে শীতে হি-হি করে মরি—

নীলাদ্রি বলল এ বাড়িতে আর লেপ নেই কিনা—লেপ মুড়ি দিতে তাই এ ঘরে এসেছি!

অধিক বলবার অবকাশ হল না, ঝনাৎ করে ওদিকে শিকল পড়ল। অর্থাৎ ভাল রকম প্রস্তুত হয়ে দরজা দিয়ে বরদা গল্প করতে আসছেন।

কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে নীলাদ্রি বলল, সংক্ষেপে সেরো, দোহাই তোমার। নইলে লেপ চাপা পড়ে দম আটকে ওর নিচে ঠিক মরে থাকব।

বরদা এসে কৈফিয়তের ভাবে বললেন, চুরুট পেলাম, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর শীত-শীত করতে লাগল, তাই জামা-টামা এঁটে এলাম। একটু দেরি হয়ে গেছে, ভয় করছিল না তো?

উমা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, নাঃ—ভয় কিসের? আপনি শুয়ে পড়ুন গে বাবা, আমার ভয় করবে না।

বরদা কথা কানে তুললেন না, নিশ্চিন্তে চৌকির উপর বসলেন। উমা গুটিসুটি হয়ে খাটে বসেছে। বরদা বললেন, হ্যাঁ মা, লেপটা গায়ে তুলে বোসো। পাশ-বালিশের উপর চাপিয়ে রেখেছ কেন?

উমা বলল, বড্ড গরম।

বল কি? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমার শীত যাচ্ছে না—আর তোমার গরম? তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করে বললেন উঁহু, ঐ যে কাঁপছ। শীত লাগছে, বুঝতে পারছ না।

বরদা উঠবার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই তড়িদ্বেগে

উমা এসে তাঁর কাছে মেঝের উপর বসে পড়ল। যে ব্যস্তবাগীশ মানুষ, —কিছু বিশ্বাস নেই—হয়তো নিজেই লেপ তুলতে যাবেন। উমা বলল, শীত নয় বাবা, ভয়-ভয় করছে—তারই কাঁপুনি। চোখ বুজলেই দেখছি, সেই বেড়াল—বাঘের মতো বড় বড় চোখ। আমি আর শোব না, আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করব।...আচ্ছা, আজকে কাছারিতে কি মামলা করে এলেন, সে কথা তো বললেন না কিছু!

এ কৌশল, কেবল উমা নয়, বাড়ির ছোট ছেলেটা অবধি জানে। মামলার গল্প বরদাকান্তকে একবার ধরিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। বরদা আরম্ভ করলেন, সে কি বলবার মতো কিছু? বাজে একটা চুরির কেস—আমি একরকম উপযাচক হয়ে বিনি-পয়সায় আসামির তরফে দাঁড়ালাম। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আইনে যা-ই থাক—আমি বলব, এ কিছুতে অন্যায় নয়। রসগোল্লার হাঁড়ি ছিল কাচের আলমারিতে; দোকানে কেউ ছিল না—লোকটা তিন দিন খেতে পায় নি, কাচ ভেঙে একটা মিষ্টি গালে দিতে যাচ্ছে, অমনি তাকে ধরে পুলিশে চালান দিল।

উমা বলল, যা-ই হোক, চুরি তো বটে!

বরদা বলতে লাগলেন, হোক চুরি। পেটে আগুন জ্বলছে. সামনে খাবার সাজানো। বলি, মুনি-ঋষি তো কেউ নয়! আমি তাই হাকিমকে বললাম, আমি হলে—

উমা প্রশ্ন করল, আপনি হলে কি করতেন বাবা?

বরদা বললেন, আমি হলে পুলিশ না ডেকে রসগোল্লার হাঁড়ি তার হাতে তুলে দিতাম। আহা বেচারা, যত খুশি খেয়ে নিক। দোকানদার বেটাদের দয়ামায়া নেই।

উমা মৃদু হেসে বলল, আপনার মতো হত যদি সবাই।

লেপের নিচে অনন্তশয্যা থেকে নীলাদ্রির ইচ্ছা করতে লাগল, বেরিয়ে এসে উমার মুখ চেপে ধরে এবং বাবার মুখের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে, আজ্ঞে না, আপনিও কম নন। আপনি হলে চোরকে জগদ্দল-পাথর চাপা দিয়ে দিতেন।

—পিছনে চাকরের হাতে হেরিকেন

গল্পে বাধা পড়ে গেল। সৌদামিনী এলেন। পিছনে চাকরের হাতে হেরিকেন।

বরদা হেসে বললেন, ও গিন্নি, পুণ্যির বোঝা বয়ে আনতে পারলে? না—হারানচন্দোর আছে বুঝি সঙ্গে! গান শেষ হয়েছে?

সৌদামিনী বললেন, কেন, আমার জন্যে কি কাজ আটকে আছে শুনি?

কি কাজ? উমাকে দেখিয়ে ববদা বলতে লাগলেন, এই যে বউমা, পরের বাড়িব এক ফোঁটা মেয়ে, একা-একা পড়ে আছে—কে পাহাবা দেয়?

সৌদামিনী হাসিমুখে একবার উমাব দিকে চাইলেন। বরদার কাছে এসে নিচু গলায় বললেন, তোমাব ব্যবস্থা ভাল। বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, পাহাবা দেবে পাড়ার লোকে।

ববদা ভ্রু-ভঙ্গি করে বললেন, ছেলের বয়ে গেছে। তাব বলে এগজামিন কত পডাশুনো। সে আমার ছেলে—অকর্মা আড্ডাবাজ তো নয়।

সৌদামিনী হেসে ফেললেন।

ছেলে না পারে, বাপ তো পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ। তুমি এখন যাও দিকি। নীলুর উপবে আসবাব এখনও দেবি আছে, ততক্ষণ আমবা একটু ঘুমিয়ে নিই।

ববদা চলে গেলে বিছানার দিকে সৌদামিনীব নজব পডল। আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কি বউমা, এ ঠিক হাবানেব কাণ্ড। দিগ্‌গজ এক বালিশ এনে খাট জুড়ে রেখেছে—শুবি কোথায়?

উমা তাডাতাডি বলল, শুয়েই তো ছিলাম। পাশ-বালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না—

সৌদামিনী শুনলেন না।

না, হবে না বই কি। আব একটা ছোট পাশ-বালিশ দেব এখন দাঁড়া, এটা আলমাবিব মাথায় তুলে দিই—

বলতে বলতে দেখা গেল পাশ-বালিশ স্বয়ংই উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন, নীলু!

নীলাদ্রির চোখে জল আসবার মতো! কিন্তু সে-জল একমুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়াল। হায় রে, বিপদের কি শেষ নেই! বরদা চুরুটের কৌটা ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা নিতে মন্থর পায়ে আবার এসে ঢুকলেন। ছেলেকে দেখে দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে এল। বললেন, এরই মধ্যে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে এলে? ক'টা বেজেছে?

নীলাদ্রি জড়িত কণ্ঠে বলল, বারোটা—

কক্ষণো নয়। এগারোটা সাত—তার সিকি মিনিট বেশি নয়। পড়তে গেলেই ঘড়ি তোমার ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে। যাও—নিচে যাও।

সৌদামিনী বাধা দিয়ে উঠলেন, না, নিচে নয়। নিচে বড্ড মশা, শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক। পড়তে হয়, এখানে বসেই পড়ুক।

বরদা বললেন, কোথায় মশা? ছেলেকে ননীর পুতুল করতে চাও যে! আমরা কাজকর্ম করে থাকি,—মশা-টশা তো দেখি নে—

মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল, রাতেই উপদ্রবটা বেশি হয় কি না!

বরদা বললেন, তাহলে আমার ঘরে বসে পড়গে। বারোটা বাজতে এখনও বাহান্ন-তিপ্পান্ন মিনিট। চিটিং-এর চ্যাপ্টার আজ শেষ করতেই হবে। কোনখানে আটকে গেলে আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। তোমার সুবিধেই হবে—কি বলো?

বরদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। নীলাদ্রি মাথা নেড়ে কাতর কণ্ঠে সায় দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌদামিনী রুখে উঠলেন, আমার হবে না। ও আলো জ্বেলে বসে বসে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না।

বরদা বললেন, তুমি এখানে ঘুমাও। পড়া হয়ে গেলে তার পর যেও। রোজই হচ্ছে, আজ নতুন মানুষ হয়ে গেলে নাকি?

সৌদামিনী জেদ ধরে বসলেন, রোজ হচ্ছে বলেই আজ হবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়ছে। আবার যে এক ঘুমের পর ছুটোছুটি করব, সে পেরে উঠব না। তাতে তোমার ছেলের পড়া হোক আর না-ই হোক—

মুশকিল! কি করা যায়? বরদা চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তা হলে বউমাকেও নিয়ে চল। নীলে এখানে পড়ুক। বারোটা বাজলে তারপর উনি আসবেন।

সৌদামিনীর তাতেও আপত্তি। না, বউমা যাবে না। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা রয়েছে, বউমা গেলে হবে না।

অতঃপর বরদার আর ধৈর্য থাকল না। রাগ করে বললেন, হবে না তো কি হবে? পরের মেয়েকে সত্যি সত্যি তো একটা ঘরে একলা ফেলে রাখা যায় না।

সৌদামিনী প্রস্তাব করলেন, নীলুকে বল, সে যদি—

সে কি করে হবে? ওর এগজামিন। বলতে বলতে সৌদামিনীর পরে একটু করুণাও হল। অবোধ মেয়েলোক—বোঝে না, এগজামিন কি এবং পেনাল-কোড কি বস্তু! ঘাড় নেড়ে বরদা বললেন, সে আমি কিছুতে পারব না। এগজামিন সামনে, ওকে আমি বলব কোন হিসাবে? একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে তো!

অনুচ্চ তরল কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, আছে নাকি? যাক, দুর্ভাবনা ঘুচল। তিনিই তখন ছেলেকে ডেকে বললেন, নীলু বাবা, তুই আজকের রাতটা এখানে বসে পড়্। বউমা একটা কথাও বলবেন না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবেন। অসুবিধে হবে?

ছেলে খুব মাতৃভক্ত বলতে হবে। ঘাড় নেড়ে সে তখনই রাজি। বরদা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝেসুজে ঠিক করে বলছ?

নীলাদ্রি বলল, আজ্ঞে, কোন অসুবিধা হবে না।

হবে না, কি করে বল? এখন নেই, পরেও তো হতে পারে! তুমি কি দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছ?

বরদার ধারণা, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পারছে না।

যেতে যতে আবার মুখ ফিরিয়ে উপদেশ দিলেন, চেঁচিয়ে পড়লে খুব মনঃসংযোগ হয়। আমি ও-ঘর থেকে শুনব। চিটিং আজ রপ্ত করে ফেলতেই হবে। কাল আমি জিজ্ঞাসা করব।

ওঁরা চলে যেতেই নীলাদ্রি দরজায় খিল এঁটে বাঁচল। উমা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজেছে।

উমারাণী!

উঁ—

নীলাদ্রি বিছানার ধারে এসে অনুনয় আরম্ভ করল, লক্ষ্মীটি, চোখ মেল। দেখ, কি চমৎকার রাত! একটি বার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—

উমাও বলল, চমৎকার!

কি?

আজকের রাত।

তোমার মুখ তো এদিকে। এদিকের দরজা-জানলা বন্ধ।

উমা চোখ মেলে স্বামীর একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, রাত্তির বেলা বন্ধ ঘরই তো খাসা।

ঘুমোবার মজা হয়—না?

উমা বলল, আচ্ছা, ঘুমের পরে তোমার অত রাগ কেন বলো তো? নিজের ঘুমোবার জো নেই—বই মুখস্থ করতে হয়—অন্যের ঘুম তাই দেখতে পার না।

নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল, এমন রাত্রে ঘুমানো অপরাধ।

চপলকণ্ঠে উমা বলল, তোমার পেনাল-কোডে এ-সব লেখা রয়েছে বুঝি!

হ্যাঁ, এবং ঘুমলে কি শাস্তি, তা-ও রয়েছে। শুনবে?

উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, রক্ষে কর মশাই। এখন নয়—কাল। বাবা যখন পড়া জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁকে শুনিয়ে দিও।

দরজায় করাঘাত। বাইরে থেকে বরদা ডাকছেন, নীলে, নীলে—

প্রদীপ উস্কে নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে যা মনে এল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল।

সর্বনাশ, গোলমালের মধ্যে পেনাল-কোড উপরে আনাই হয় নি—আইনের কোন বই-ই নেই—খুঁজতে খুঁজতে কুলুঙ্গির কোণে মিলল, মায়ের আধ-ছেঁড়া মহাভারতখানা। সেটা সামনে নিয়ে সে প্রাণপণ চিৎকারে আইনের ধারা মুখস্থ করে চলল।

আরও বিস্তর ডাকাডাকির পর মনোযোগী ছাত্র দরজা খুলে দিল। বরদার প্রসন্ন মুখ, ছেলের পাঠ অভ্যাস বাইরে থেকে কিছু কিছু তাঁর কানে গিয়েছে নিশ্চয়। তিনি সোজা উমার খাটের কাছে গিয়ে ডাকলেন—অ বউমা, বউমা, ঘুমুচ্ছ তো? দেখতে এলাম।

ঘুমন্ত লোকে কথা বলে না, অতএব উমার জবাব পাওয়া গেল

না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বরদা ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ। শুয়ে-শুয়ে তাই মনে হল, মা-লক্ষ্মীর ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে কি না দেখে আসি।

নীলাদ্রি বলল, তবে মনে মনেই পড়ি—

বরদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন, না না, তাতে কাজ নেই—আগাগোড়া মুখস্থের ব্যাপার, ও কি মনে মনে পড়ার কাজ? বিশেষ, যখন কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না...কিন্তু সাবধান, সাবধান! পরের মেয়ে এসেছে, গিয়ে নিন্দে-মন্দ না করে। ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেটা দেখবে।

নীলাদ্রি বলল, তা দেখছি বই কি। ঐ তো—খুব অসাড় হয়েই ঘুমুচ্ছে।

তোমার যা কাণ্ডজ্ঞান, তোমার উপর আমি ভরসা করি কি না! আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব।

মনের বিরক্তি গোপন করে সহজ সুরে নীলাদ্রি বলল, শীতের দিনে বার বার কষ্ট করে আসবার দরকার কি বাবা?

বাপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

কষ্ট হয়, আমার হবে। তোমার তাতে ক্ষতিটা কি শুনি? পরের মেয়ে এসেছে, আমার নিজের মেয়ে নেই—তাকে একটু যত্নআত্তি করব, তাতে তোমার হিংসে হয় বুঝি?

তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে নীলাদ্রি বলল, বার-বার দুয়োর খোলা—পড়ায় মনঃসংযোগের একটু ইয়ে হয় কি না—

এতক্ষণে বরদার নজর পড়ল, দালানের দিক্‌কার জানালাগুলো বন্ধ। বললেন, সমস্ত এঁটে দিয়ে অন্ধকূপ করে রেখেছে। তাই ঘর থেকে

গলা শুনতে পাচ্ছি না। তোমার বার-বার দুয়োর খুলতে হবে না বাপু, জানালা খুলে রাখ—আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাব।

উমা নির্বিকার নিরীহ মানুষটির মতো পড়ে আছে। এবং সে যে ঘুমোয় নি, কোন দিক থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। নীলাদ্রির কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হল, চাপা হাসির প্রবাহে ওষ্ঠ তার একটু একটু নড়ছে এবং চোখদুটো মিটমিট করছে। অথচ এর প্রতিকার নেই। সূচ পড়বার শব্দও খোলা-জানালার পথে বাবার শব্দভেদী কানে গিয়ে পৌঁছবে, এবং যে-কোন মুহূর্তে জানালায় উদয় হয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন, চিটিং শেষ হল?

নিচের ঘর থেকে সে পেনাল-কোডখানা নিয়ে এল। উমার শিয়রের দিকে খানিকটা দূরে টেবিল টেনে আনল। তারপর যথাসম্ভব উমার কর্ণবিবর লক্ষ্য করে আকাশভেদী কণ্ঠে পড়া শুরু করল। ঘুমের ঘোরে উমা পাশ ফিরল, পড়া আরও তীব্র হল; ঘুমের ঘোরেই বোধ করি সুগৌর হাতখানা কানের উপর চাপা দিয়ে এসে পড়ল, বিপুলতর উৎসাহে নীলাদ্রি আরও গলা চড়িয়ে দিল।

জানালার ওদিকে এসে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, নীলু, কি আরম্ভ করেছিস? বাড়িসুদ্ধ কাউকে ঘুমুতে দিবি নে?

নীলাদ্রি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, বাবা যে বললেন।

ওঁর কি, একটা কিছু বললেই হল! মা-লক্ষ্মীর জন্য এদিকে দরদ উথলে ওঠে। আরে, এ পড়ায় যে মরামানুষ ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে।

বরদাও সঙ্গে এসেছিলেন। বিরক্ত ভাবে তিনি বললেন,

এগজামিন সামনে, সেটা দেখতে হবে তো?...তা নীলে, বরঞ্চ যতটা পড়েছ, এখন মনে মনেই আবৃত্তি কর। চিটিং-এর কত দূর?

নীলাদ্রি বলল, আজ্ঞে, রপ্ত হয়ে গেছে।

সৌদামিনী বললেন, আবার জানালা খুলে দিয়েছিস কেন রে নীলে? চোখে আলো গিয়ে লাগছে, ঘুম হচ্ছে না।

নীলাদ্রি বলল, বাবা যে বললেন—

বরদা সদয় হয়ে বল্লেন, তা নীলে, এখন বরং জানালা বন্ধ করেই পড়। তোমার মার ঘুম হচ্ছে না—শরীরটে আজ ভাল নেই।

সশব্দে জানালা বন্ধ হতেই বরদা মনের আনন্দ আর গোপন রাখতে পারলেন না। হেসে হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের কি রকম পড়াশুনোয় চাড় হয়েছে! বারোটা কখন বেজে গেছে, পড়তে পড়তে তা হুঁশই নেই। আমি আবার ওদিকে চুরি করে ঘড়ির কাঁটা পনর মিনিট পেছিয়ে রেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাশ হয়ে যাবে—

বাপ মারা গেলেন, কিন্তু বিষয় রইল। বিশ্ববিদ্যালয়েব সম্পর্ক চুকিয়ে সুধানাথ অতঃপর নিশ্চিন্তে বৈঠকখানাব ফরাসে জাঁকিয়ে বসবার উদ্যোগে আছে, এমন সময় গোমস্তা এসে আদালতের ছাপ-মারা স্তূপাকার কাগজপত্র সামনে হাজির করল।

সুধানাথ সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি?

খাঁদাগাঁতিব খামার নিলাম হয়ে গেছে। আট আনা পার্বণী নিয়ে কর্তা জমিদারেব সঙ্গে গোলমাল করেছিলেন। এবার সদবে ছুটতে হবে।

সদরে আদালত-বাড়িটা বাইরে থেকে দেখা আছে, কিন্তু সাহস করে সুধানাথ কোন দিন ভিতরে ঢোকে নি। শোনা আছে, ওব টিকটিকিগুলোও বিনা ঘুষে হাঁ করে না। কেমন কবে কি ভাবে যে সেই আদালতের মুখ থেকে খামারজমি উদ্ধার করে আনতে হবে, ভাবতে গিয়ে সে কূলকিনারা পায় না।

গোমস্তা বলল, দেরি করলে হবে না বাবু। একটা ভাল উকিল দাঁড় করিয়ে হাকিমকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুনর্বিচারের দরখাস্ত করে দিন গে।

উকিলের কথায় আলো দেখা গেল। নীরদবিহারী উকিল ভাল, সুধার পিসতুত ভাই, তালেশ্বরে বাড়ি, সদর থেকে ক্রোশ তিনেক পথ মাত্র। নীরদ বাড়ি থেকেই শেয়ারের নৌকায় আদালত যাতায়াত করে। দিনটা বৃহস্পতিবার, রথের ছুটি। সে হিসেবেও সুবিধা। আজ গিয়ে ধীরে-সুস্থে নীরদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করা যাবে। দরখাস্ত দাখিল হবে আগামী কাল প্রথম কাছারিতে।

নৌকায় যেতে হয়। তালেশ্বরের ঘাটে পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা। জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু মেঘের দৌরাত্ম্যে চাঁদ স্পষ্ট হয়ে ফুটতে পারে নি। নীরদের বিয়ের সময়—এই বছর পাঁচ-ছয় আগে সুধানাথ একবার এ-বাড়ি এসেছিল। নূতন বউদিদির সঙ্গে তখন যৎকিঞ্চিৎ আলাপও হয়েছিল। ইতিমধ্যে নীরদের এক খোকা হয়েছে। এবার সুধানাথের বাপের শ্রাদ্ধের সময় এঁরা সবসুদ্ধ তাদের বাড়ি গিয়ে দিন-কুড়িক ছিলেন। আসবার সময় লীলা বার-বার মাথার দিব্যি দিয়েছিল, যেও ঠাকুরপো আমাদের ওখানে। যেও কিন্তু। সুধানাথও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এত শীঘ্র সে প্রতিশ্রুতি পালন করবার আবশ্যক ঘটবে, তখন স্বপ্নেও ভাবা যায় নি।

নদীর ঘাট থেকে পা কয়েক গিয়েই বাইরের উঠান। কোন দিকে জনমানবের সাড়া নেই। আবছা অন্ধকারে বাড়িটা থম-থম করছে। রোয়াক পেরিয়ে গোটা দুই-তিন খালি ঘরের ভিতর দিয়ে সে এসে পড়ল ভিতর-উঠানে। তারপর আবার সুদীর্ঘ রোয়াক অতিক্রম করে দালানে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—যাক্, বাঁচোয়া—মানুষের চিহ্ন মিলেছে এবার, এবং যে-সে মানুষ নয়—স্বয়ং বউদিদি ঠাকরুন।

পাশের টেবিলে উজ্জ্বল পাক্‌-আলো জ্বলছে। বউদিদি পিছন ফিরে দেয়ালে-টাঙানো আয়নায় নিবিষ্টমনে চুল ঠিক করছেন।

—চোর! চোর।

সুধানাথ পায়ের জুতা খুলে রেখে টিপি-টিপি এগুতে লাগল। একেবারে পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বউদিদির হুঁশ নেই। খোঁপায়

সোনার কাঁটা ঝিকমিক করছে, সুধানাথ সাফাই হাতে সেটা তুলে নিতে গেল। নিলও ঠিক, ঐ সঙ্গে ক-গাছি চুল উঠে এল। এক ঝটকায় দু-তিন হাত সরে গিয়ে মুখোমুখি তাকাল—সর্বনাশ—বউদিদি তো নয়, আর একটা মেয়ে। মেয়েটি হতভম্ব। সুধানাথও তাই; হাতে সোনার কাঁটা ঝকমক করছে। সেদিকে লক্ষ্য করে মেয়েটি চেঁচাতে শুরু করল, চোর! চোর!

সর্বনাশ। তন্বঙ্গী কিশোরী মেয়ে···চুরির বমাল হাতের মধ্যে। পৃথিবী দ্বিধা হোক, সেই ফাঁকের মধ্যে সুধানাথ ঢুকে পড়তে রাজি। কিন্তু তা যখন হল না—যে পথে এসেছে সেই পথেই সে সোজা দৌড় দেবে কিনা ভাবছে—এমনি সময় দুই দরজা দিয়ে প্রায় যুগপৎ হাঁপাতে হাঁপাতে যুগলে এসে পড়ল—নীরদ-দাদা ও লীলা-বউদিদি।

বউদিদি বলল, কি হয়েছে, দুগ্‌গা?

দুর্গা দু-চোখে আগুন ছড়াচ্ছে, দারুণ রাগে মুখ লাল। হাত দু-খানা কোমরে দিয়ে কুস্তিগিরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, চোর·· চুরি করেছে দিদি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, পিছন থেকে এসেই—

নীরদ সুধানাথের অবস্থা দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, কি চুরি করেছে বোন? হিয়া-মন-প্রাণ নাকি?

লীলাও হেসে তাড়াতাড়ি কলকণ্ঠে সুধানাথকে অভ্যর্থনা করল, কি ভাগ্যি—মেঘলা রাতে চাঁদের উদয়! জল-কাদায় গা-হাত-পা সমস্ত যে চিতেবাঘের চামড়া হয়ে উঠেছে। ওরে কালীপদ, জল নিয়ে আয়। ঘটির কর্ম নয়—কলসি, কলসি—

বেশ সুখী এরা। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই আমুদে। হাসি-খুশির মধ্যে

দিনগুলো পাখনা মেলে উড়ে যায়। সুধানাথ নিশ্বাস ফেলল। এমনি তার কপাল—এই আনন্দের হাটে এসে পড়ে হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটিয়ে বসল, জের তার কিছুতে মিটছে না। অর্থাৎ রণরঙ্গিণী বেশে দুর্গা অন্তরালবর্তিনী হয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই।

ঘণ্টা দুই পরে নীরদ আর সুধানাথ খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। খোকা ঘুমিয়েছে। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা—ছড়-ছড় করে রোয়াকের উপর নলের জল পড়ছে। গল্প কেমন যেন জমেও জমছে না।

অবশেষে নীরদ ডাকল, দুর্গা দেবী!

ডাকের পর ডাক। দেবী প্রসন্ন হলেন না। সুধানাথ বলল, ডাকাডাকি করে মান আরও বাড়িয়ে তুলছ দাদা। তার চেয়ে আমার মামলার কথাটা শোন দিকি এইবার।

নীরদ হেসে তাড়া দিয়ে উঠল, বুকের পাটা কম নয় দেখছি! চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে···চুপ, চুপ, ওরে হতভাগা—

এমনি সময় দ্রুতপদে এসে দাঁড়াল লীলা।

ডাকছ তোমরা?

নীরদ বলল, ডাকছি, কিন্তু তোমাকে নয়। তোমায় ডাকলে লাউয়ের ঘণ্টে নুন পড়বে না। এই অবস্থায় ডাকব, সত্যি সত্যি আমরা কি এমনি বোকা?

লীলা বলল, তাই তো বলি। তোমার সকল রস-জ্ঞান রসনায়। হঠাৎ পরমহংস হয়ে গিয়ে যে ক্ষীর ছেড়ে নীরে রুচি জন্মাবে...কিন্তু দুগ্‌গা ছুটে গিয়ে বলল, যাও দিদি, শিগগির—আমি তরকারি দেখছি।

সুধানাথ বলল, তিনি! তা হলে আবার ডবল নুন পড়বে না তো? যে রাগ করে গেছেন!

নীরদ ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল, সেটি হবার জো নেই ভাই। দুর্গাদেবী ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—কলেজে সায়ান্স কোর্স নিয়েছেন। একবার এক নজর ভিতর দিকে চেয়ে সে মুখ টিপে হাসল, বলতে লাগল, বোনটির আমার ল্যাবরেটরির জানলায় উঁকি দেওয়া অভ্যাস আছে। চালাকি কথা নয়। নিক্তি মেপে আউন্স হিসাবে নুন দেন। তরকারি ধরে যেতে পারে, শুকিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নুনের গোলমাল হবে না—

জামাই বাবু! আচম্বিতে দুর্গার আবির্ভাব। কণ্ঠ-ঝঙ্কারে পুরুষ দু'টিকে সচকিত করে বলতে লাগল, জামাই বাবু, আপনাদের পাড়া-গাঁয়ের লোক এমন নিন্দুক!

নীরদ বলল, এ কি বোন, রান্নাবান্না এরই মধ্যে সারা করে এলে?

না, নামিয়ে রেখে এলাম। জবাবটা নিয়ে আবার গিয়ে চাপাব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কবে আপনাকে পোড়া-তরকারি খাইয়েছি?

গলা হঠাৎ খাদে নেমে গেল। অর্থাৎ বজ্র-বিপ্লবের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা। এর জন্য নীরদ প্রস্তুত ছিল না। বারম্বার বলতে লাগল, নাঃ, তোমাদের নিয়ে চলে না। একটা ঠাট্টা করলাম, তাতেই একেবারে···লোকে যে বলবে, একেবারে খুকি!

এবং লোকটি একেবারে তৈরিই ছিল। কথায় কথায় যে রাগ করে, তাকে রাগাতে ভারি মজা। ভালমানুষের মতো সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল, খুকিটি কে বউদি?

লীলা বলল, ঐ যে শুনলে ভাই, দুগ্‌গা।

দুর্গা নয়, রাণী দুর্গাবতী বলুন। মিলিটারি রকম-সকম দেখে সেটা আন্দাজ হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই খুকি দুর্গাবতীটি তোমার কে হন?

—যেন ঝড় উঠেছে, কলোচ্ছ্বাসে বন্যা জেগেছে

লীলা বলবার আগেই নীরদ জবাব দিল, উনি ওঁর বোন। কিন্তু

তুমি হতভাগ্য কেবল ওঁর মিলিটারি হুলের খোঁচা খেয়েই গেলে, মধু পেলে না—

সুধানাথ বাধা দিয়ে বলল, সে কি কথা দাদা, খুবই পাচ্ছি। এ-বাড়িতে পা দেওয়া থেকেই। ওঁর কণ্ঠ সত্যিই মধুময়।

ঠাট্টা? ওরে ইডিয়ট, জান না তো ক্ষমতা! গান-বাজনায় মেডেল পেয়েছে। কি গলা, কি রকম মিষ্টি! যাও তো দিদি ঐ টুলের উপর। মুখ্যুটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দাও।

দেয়াল ঘেঁষে দামি অর্গান। পাড়াগাঁ হলেও এ-ঘরে ও-ঘরে অনেক কিছু শৌখিন আসবাব সাজানো। আশ্চর্য! এত কথান্তরের পরেও নিরাপত্তিতে গিয়ে দুর্গা বাজনার সামনে বসল। সুধানাথ মনে মনে হাসল—বাহাদুরি দেখাবার লোভ এদের এমনি বটে! তারপর দুর্গা প্রবলবেগে অর্গানের চাবি টিপে চলল—যেন ঝড় উঠেছে, কলোচ্ছ্বাসে বন্যা জেগেছে। লীলার বাঁচোয়া, সে ইতিমধ্যে কখন রান্নাঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছে। এদিকে দু'জন অভাগ্য শ্রোতার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মহাপ্রলয়ের সময় মহামারী, প্লাবন, কল্কি-অবতার, বেগুনতলায় হাট প্রভৃতি সকল উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত এই রকম সুরবৃষ্টিও শুরু হবে। পুরো আধ ঘণ্টা ধরে চলল এই রকম তুমুল বাদ্যভাণ্ড। বাপ রে বাপ, মেয়েটার আঙুলেও ব্যথা ধরে না!

অবশেষে সুধানাথ নীরদের কানে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে প্রাণপণে শ্রুতিগম্য করে বলল, দাদা, স্বীকার করছি—এক-শ বার স্বীকার করছি, ক্ষমতা আছেই। থামতে বলো। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন সত্যি, ঘুরে পড়বার জোগাড়—

নীরদ বলল, পরিত্রাহি দেবি, আপাতত স্থিরো ভব। যথেষ্ট হয়েছে।

বিশাল চোখ দুটো তাদের দিকে স্থাপন করে ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্গা বাজনা বন্ধ করল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, এ রকম হবে, আমারই অনুমান করা উচিত ছিল।

কি ?

আমি স্বেচ্ছায় বাজাতে বসি নি, আপনারাই ডেকে বসিয়েছেন। পাড়াগাঁয়ের লোক আপনারা জামাইবাবু, কথায় কথায় লগুড় ধরা অভ্যাস। মেয়েদের মর্যাদা বুঝবেন কি! দুর্গা পুনশ্চ একবার চাবি-গুলোর উপর দিয়ে দ্রুত আঙুল বুলিয়ে গেল। বলল, এইবার গান হবে। ডেকে বসিয়েছেন, মনে থাকে যেন। শেষ না হলে উঠতে পারবেন না। গানও লাগবে ভাল। জানেন তো, মেডেল পেয়েছি।

সুধানাথ বলল, আপনি বলে দিন দাদা, মেডেল পেলে থামেন যদি, তাতে রাজি আছি। গাইবার দরকার নেই।

কিন্তু নাছোড়বান্দা ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়, গলা সাধা আরম্ভ হয়ে গেল। সহসা যেন ঐশ্রী-প্রেরিত হয়ে লীলা এসে উদ্ধার করল। বলল, জায়গা হয়েছে, এসো তোমরা।

ঘুম থেকে উঠতে সুধানাথের বড্ড বেলা হয়ে গেল। নীরদ তখন বৈঠকখানায়। সেখানে গিয়ে দেখে, মামলার কতকগুলো দলিলপত্র সামনে রেখে চেয়ারে বসে সে-ও ঘুমচ্ছে। কাঁধে হাত রাখতেই সচকিত হয়ে নীরদ হেসে ফেলল।

সুধানাথ বলল, দাদা মক্কেলের টাকা খেয়ে এই রকম ভাবে কাজ করছ ?

নীরদ বলল, আমার দোষ নেই ভাই, যত দোষ এই কানফোঁড়া

নথিগুলোর। পড়তে গেলেই ঘুম পায়। এখন আমি ঘুমচ্ছি—আবার কাছারি গিয়ে যখন পড়তে আরম্ভ করব, হাকিমেরও ঘুম পাবে।

সুধানাথ বলল, যাই হোক, আমার কাগজগুলো আনি এইবার।

হবে, হবে। চা হয়ে যাক আগে। ওগো দেবীযুগল, কৃপা করে আবির্ভূতা হও।

আইন-নজীর-নথিপত্র—ভাব দেখলে মনে হয়, নীরদ বাঘের মতো ভয় করে, পাশ কাটাতে পারলেই বেঁচে যায়। অথচ সে পশারওয়ালা ভাল উকিল। যেমন লোকে যাত্রা-থিয়েটার দেখে, তাস খেলে, গালগল্প করে—আদালতে দাঁড়িয়ে মামলা-মোকর্দমা চালানো তার বেশি সে মনে করে না কিছু।

দুই বোনে এসে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে প্রাতরাশের আয়োজন। দুর্গা কোন দিকে না তাকিয়ে নিবিষ্টমনে চা ঢালছে, যেন সেখানে একটিও মানুষ নেই—ঠাকুরঘরে নিতান্তই সাত্ত্বিকভাবে লোকে যেমন নৈবেদ্য সাজিয়ে যায়, ঠিক তেমনি। গরম চা এক চুমুক খেয়ে সুধানাথ দিনের বেলা ভাল করে মেয়েটির দিকে তাকাল। মুখখানা কচি কচি···বয়স যা, মুখভাবে তার চেয়ে ঢের বেশি কোমল দেখায়,—বুদ্ধির অপূর্ব দীপ্তিতে সমস্ত মুখ ঝক-মক করছে। কাল রাত্রে কথাবার্তার ধরনে এক-একবার মনে হয়েছিল শক্তিমান প্রতিপক্ষ। এখন সকালের আলোয় বোঝা গেল, এ ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করা হাস্যকর, একে কেবল ক্ষেপিয়ে মজা দেখতে হয়।

নীরদ বলল, চা রেখে দিলে যে!

হাসি চেপে মুখ বাঁকিয়ে সুধানাথ বলল, খাওয়া যায় না।

কোন দোষ হয়ে গেছে ভেবে দুর্গা অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। নীরদ আবার টিপ্পনী কেটে বলল, চিনির বদলে ময়দা মিশিয়ে দাও নি তো দিদি? যে শুভক্ষণে তোমাদের দেখা!

—দোহাই দিদি, দেখ—চেয়ে দেখ একটুখানি।

দুর্গা চোখ তুলে দেখে, দু-জনে মুখ টিপে হাসছে। বুঝলে, সব মিথ্যা, দু-ভাই ষড়যন্ত্র করে তাকে অপদস্থ করতে লেগেছে। রাগের

বশে আর তার কাণ্ডজ্ঞান রইল না—সুধার অল্প-খাওয়া চায়ের বাটি নিয়ে দিল এক চুমুক। বলল, এমন মিথ্যুক সব! দোহাই দিদি দেখ—চেখে দেখ একটুখানি।

নীরদ হো-হো করে হেসে হাততালি দিয়ে উঠল।

দুর্গাদেবী, তোমার পক্ষে ঐ চা মহাপ্রসাদ—অমৃত সমান। কিন্তু তোমার দিদি...বলি, তুমি খেতে পার বলে ও খায় কেমন করে?

দুর্গা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, খেয়েছি—বেশ করেছি। এক-শ বার খাব। কাল থেকে লেগেছেন সব। মিথ্যে নিন্দে—মিথ্যে কথা—গালাগালি—

দ্রুতপদে সে ঘর ছেড়ে চলল। লীলা ডেকে বলল, আর এক কাপ চা নিয়ে আয় লক্ষ্মী ভাই। ঠাকুরপোর খাওয়া হল না।

দুর্গা ঝঙ্কার দিয়ে চলে গেল, ইঃ, আমার বয়ে গেছে। খাওয়া হল না হল—ভারি তো আমার!

একটু থমথমে ভাব ঘরের মধ্যে। তারপর সুধানাথ হেসে বলল, বউদি মনে মনে চটে যাচ্ছেন। কোথাকার উড়ো-আপদ এসে বোনকে জ্বালাতন করছে—

লীলা বলল, বউদির জ্বালাটাই বড্ড কম কিনা! ও তোমাদের পুরুষমানুষের ধরন। জিজ্ঞাসা কর, তোমার দাদাটিকে। আমি ভাল মানুষ, তাই সয়ে যাই। বোন আমার বড্ড রাগি। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি বিয়ে করবে না?

সুধানাথ বলল, তার চেয়ে জরুরি দরকারে এসেছি বউদি। বিয়ের ঢোল দু-দিন পরে বাজালে চলবে; কিন্তু নিলামের ঢোল-সহরৎ সবুর মানবে না।

নীরদ অভয় দিয়ে বলল, কুছ পরোয়া নেই। সে ভাবনা আমার। বুড়ো হাকিমটা বড্ড ভালমানুষ···সাধ্যসাধনা করে তোমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত ঠিক মঞ্জুর করিয়ে দেবো।

সুধা বলল, এদিককার হাকিমও ভালমানুষ, কিন্তু বড্ড কড়া। তাহলে কাছারির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আমিও সাধ্য-সাধনা শুরু করে দিই—কি বল্?

আনন্দের হাসিতে লীলা ও নীরদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লীলা বলল, সত্যি ঠাকুরপো, আমার বোনকে তুমি পায়ে নেবে? মা-বাবা নেই, তাই ওর বড্ড অভিমান। নইলে—

সুধা কথাটা শেষ করতে দিল না। পায়ে? কি যে বল বউদি! শিবের মাথায় সাপ···তাই রক্ষে। পায়ে থাকলে—সব নাশ! ভাবতেও ভয় লাগে।

হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত ঘর ভাসিয়ে লীলা বেরিয়ে গেল।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে আবার চা এল। এবার নূতন ব্যবস্থা। কালীপদর হাতে সমস্ত সরঞ্জাম—সে-ই তৈরি করতে লাগল—দুর্গা আলগোছে পিছনে, নিতান্ত নিরপেক্ষ দর্শকের মতো। হঠাৎ সে হাঁ-হাঁ করে উঠল, ওরে বেকুব, থাম্ থাম্—আগে জামাইবাবুকে দিয়ে পরখ করিয়ে নে। চিনি না ময়দা। দুধ না খড়ি-গোলা। জানিস নে, পাড়াগাঁয়ের লোক—এঁরা দিনকে রাত করতে পারেন।

খোশামোদ করলে গোলমালটা যদি মেটে, সেই ভরসায় সুধানাথ বলল, দাদা, এইটুকু মেয়ে কলেজে পড়েন? খুব আশ্চর্য তো!

নীরদও বোধ হয় সন্ধির প্রত্যাশী। বলল, দুর্গা দিদি আমাদের বড় ভাল মেয়ে। কলেজে যায়, ট্রিগোনমেট্রি কষে, কাগজে গল্প

লেখে, ডিবেটিং-ক্লাবে বক্তৃতা দেয়, আবার ফার্স্ট-এডও পাশ করে বসে আছে।

প্রশংসমান চোখে সুধা মেয়েটির দিকে তাকাল। দুর্গা তখন অবিকল নীরদের স্বর নকল করে বলতে লাগল, এবং চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, নাকে নিশ্বাস নেয়…কিন্তু অমন অবাক হয়ে দেখার কি আছে জামাই বাবু?

বিশ্বাস হয় না। এক মুহূর্তে সুধানাথের মনের সয়তানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, কিছুতে বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা ট্রিগোনমেট্রি যে কযেন—বানান করুন দিকি ট্রিগোনমেট্রি—

সপ্রতিভ কণ্ঠে দুর্গা বলল, ডি-ও-এন-কে-ই-ওয়াই—

পিছনে হাসির হুল্লোড়। দুর্গা ছুটে পালিয়ে গেল।

মামলার ইতিহাসটা মুখে মুখে বলে অতঃপর সুধানাথ দলিলপত্র নিতে ভিতরে এসেছে। তারই সম্বন্ধে কথা চলছে শুনে দালানের কোণে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াল। দুই বোনে আলোচনা চলছে। অবস্থা ইতিমধ্যেই সঙ্গিন হয়ে উঠেছে।

দুর্গা বলছে, এক ফোঁটা মেয়ে…এইটুকু মেয়ে…খুকি, খুকি… যেন আদ্যিকালের বদ্দিবুড়োরা এসেছেন সব। কথায় কথায় যারা অপমান করে তাদের সঙ্গে…দিদি, তোমার আর কাজকর্ম নেই?

লীলা বলল, এই নাকে খৎ দিচ্ছি, আর বলব না। বুদ্ধিমান হয়েছ, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছ। বেশ তো, যা ভাল হয় কর। কিন্তু এ-ও বলে দিচ্ছি, অমন পাত্র তপস্যা করে মেলে না।

ব্যঙ্গের স্বরে দুর্গা জবাব দিল, পাত্রটা খুব ভাল। ঠণ্ঠণিয়ে বাজে। ঐ আওয়াজ শুনেই তোমাদের তাক লেগে গেছে, কিন্তু আসলে শূন্যকুম্ভ।

লীলার রাগের আর সীমা রইল না। বলল, অত দেমাক ভাল নয়। রূপে, গুণে, ধনদৌলতে এমন ক'টা মেলে? নিজের দিকে চেয়ে কথা বলতে হয়। তবু যদি রংটা কটা হত! এঁটো-পাতের ধোয়া স্বর্গে যাবে না জানি। আমরা করলে কি হবে?

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী। ব্যথার জায়গায় আঘাত পেয়ে সে একেবারে ক্ষেপে উঠল।

চাই নে রূপ, মাকালফলের কোন দরকার নেই। আর গুণের পরিচয় তো কাল আসা থেকে শুরু হয়েছে। খামকা এসেই ভদ্রমেয়েব গা ঘেঁসে অপমান করতে পারে যে—চিরজন্ম আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকব, অমন স্বর্গ আমি চাই নে কোনদিন।

শেষদিকটায় স্বর অস্বাভাবিক রকম বিকৃত। বোধ করি কান্না চাপতেই সে ছুটে বেরুচ্ছিল, হঠাৎ বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়াল—সামনে সুধানাথ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লীলাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপমানে সুধানাথের মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেছে। লীলা তাড়াতাড়ি বলল, ঠাকুরপো এখানে?

সুধানাথ বলল, হ্যাঁ বউদিদি, দৈবাৎ এসেছি। আমার সম্বন্ধে সুখকর সমস্ত আলাপ কানে গেছে।' জবাব দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

লীলা তাড়াতাড়ি বলল, কিছু মনে কোরো না, ভাই। ও একটা পাগল।

সুধানাথ বলল, তবু সাফাই দেবার প্রয়োজন। কাল হঠাৎ ওঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু সেটা জেনে-শুনে নয়।

লীলা বলল, তার আবার বলবে কি ঠাকুরপো, আমরা কি জানি নে?

সুধা বলল, তোমরা জানলেও, ওঁর নিজের একটু ভাল করে জানা দরকার। আমি আমার নিজের মুখই আয়নায় দেখতে গিয়েছিলাম। ওঁর মুখ উল্টো দিকে ফেরানো ছিল, সুমুখে থাকলে আপনা থেকেই এক-শ হাত তফাতে থাকতাম। নিজের সম্বন্ধে ওঁর বড় অনর্থক গর্ব। সেটা ভাল কথা নয়। খোলাখুলি বলে ফেললাম। অপরাধ নেবেন না বউদি।

চোখ তুলে উভয়ের মুখে দুর্গা একবার তাকাল। ওষ্ঠ থর-থর করে কাঁপছে, কিছুই সে বলতে পারল না। টলতে টলতে খাটের উপর মুখ গুঁজে পড়ল। সুধানাথ নির্বিকার গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে গেল।

রাগ কমলে তখন সুধানাথের অনুতাপ হতে লাগল। ছেলেমানুষ —এবং একটু রাগি স্বভাবের হলেও দোষ তো তার। সে-ই এসে অবধি ক্রমাগত বেচারিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

বাড়ির মধ্যে দুর্গার আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই ভাই খেতে বসেছে, বউদিদি দেওয়া-থোওয়া করছেন। তাঁরও গম্ভীর মুখ— বোনের ব্যথা তাঁরও মনে বিঁধেছে নিশ্চয়। লজ্জায় সুধানাথের মনে হতে লাগল, একছুটে এ-বাড়ির ত্রিসীমানা পেরিয়ে চলে যায়।

নীরদ পান চিবোতে চিবোতে তাড়াতাড়ি পোষাক পরছে, সুধানাথ বলল, দাদা, আমিও আসি?

নীরদ বলল, কোন দরকার নেই। লম্বা ঘুম দাও। আজ আমি কাছারি থেকে সব জেনে-শুনে আসব। দরকার হলে কাল যেও।

সুধানাথ বলল, তার চেয়ে ঘুরে আসি না কেন। একা একা—কাজকর্ম নেই, সময় কাটে কি করে?

আর এক দফা ঝগড়া বাধিয়ে নিও, সময় উড়ে যাবে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমায় স্টুপিড। কৃত্রিম ক্রোধে নীরদ সুধানাথের দিকে চোখ পাকাল। আমাদের কেউ একথা বললে তো আর ঘাড় ধরে ঠেলে না দেওয়া পর্যন্ত নড়ি নে।

সুধানাথ আর প্রতিবাদ করল না। তার মনেও আশার আলো খেলে গেল। ঐ তো মেয়ে···ঝগড়া করতে না পেরে এতক্ষণ তার দম আটকে আসছে নিশ্চয়। এমন চুপচাপ কতক্ষণ থাকবে আর? এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেছে। ঘুম ভাঙতে বেলা পড়ে এল। পাশেই মুখ ধোবার জল, ডিবেয় পান সাজানো। মানুষ নেই। সুধানাথ সোজা ভিতরে চলে এসে বলল, বউদি!

লীলা দুর্গার চুল বাঁধছিল। উঠে এসে তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল। গম্ভীর আনতমুখে দুর্গা ঘর থেকে চলে গেল।

নিশ্বাস ফেলে সুধানাথ বলল, বউদি, আমার দোষ হয়েছে মানি। কিন্তু দোষটা কি শুধু এক পক্ষের? বোনের দিক নিয়ে রাগ করে তুমিও চুপচাপ বসে আছ—কিন্তু আমি দেওর না হয়ে ভাই হতাম যদি, এমন মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতে?

লীলা বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, ভাই—তোমার দোষ কি? অমন বললে কোন্ পুরুষমানুষের রাগ না হয় বলো।

আমাদের উনি যদি হতেন, চিরজন্মের মতো আর মুখ দেখতেন না
ও দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, সত্যি বড্ড আদিখ্যেতা মেয়ের—

বিরক্ত মুখে অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, ঐ রকম করে। রাগ করে একবেলা দু-বেলা খায় না, কথা বলে না। উনি আসুন, ওঁর কাছে মুখ গোমড়া করে থাকবার জো নেই। পাঁচটা বেজেছে তো—উনি এই এলেন বলে!

অতএব তখন নীরদের আশায় সুধানাথ মিনিট গুণতে লাগল।

সন্ধ্যার পর আবার সেই দালানের খাটে দুই-জনে বসেছে। সুধানাথ বলল, তারপর কোর্টের খবর বল। কাজ যদি এমনি-এমনি হয়ে যায়, কালই আমি চলে যাব দাদা।

নীরদ বলল, কে তোকে এখানে জল-বিছুটি দিচ্ছে, বল্ দিকি?

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আর কে? তোমার ঐ আহ্লাদি ঠাকরুন। সেই সকাল থেকে আলাপ বন্ধ। দুদিনের জন্য এসেছেন, ঝগড়াঝাঁটি ওর কাঁহাতক ভাল লাগে?

হো-হো করে ছাদ-ফাটা হাসি হেসে নীরদ বলল, অবস্থা গাঢ় হয়ে উঠেছে বল। একটা দিনে এত উন্নতি? আশ্চর্য তো! কিন্তু আসামী গেল কোথায়?...আরে, আরে, পালাস নে বোন, কথা বলতে হবে না। তুই আয় এখানে।

ছুটে গিয়ে নীরদ দুর্গার হাত ধরে নিয়ে এল। মেজের উপর ঝুপ করে দুর্গা বসে পড়ল। নীরদ বলল, আহা-হা, ওখানে কেন? ঐ টুলের উপর গিয়ে বোস। কাল বাজনা হয়েছে, গান শুনিয়ে দাও আজকে। আরে কথা না বল না-ই বললে, গান গাইতে দোষ কি?

ঘাড় নিচু করে দুর্গা সেই যে বসল, কিছুতে আর নড়ান গেল না। নীরদ পাশে এসে কত বোঝাতে লাগল, আর অত রাগ করে না। রাগরঙ্গুলো সব আগে ভাগে হয়ে গেলে, শেষকালের জন্য থাকবে কি? শোন ভাই, কথা রাখ—

একবার এক ফাঁকে উঠে দুর্গা পালিয়ে গেল। একেবারে বিছানায় গিয়ে পড়ল। নীরদ বলতে লাগল, ধর্, ধর্। তারপর হেসে বলল, না। বড্ড রেগেছে, আজকে আর হবে না দেখছি।

সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল, কোর্টের খবর কি?

জিভ কেটে নীরদ বলল, বিলকুল ভুলে গেছি, ভাই—

সুধানাথ বলল, যা-হয় হোক গে। আমার থাকবার জো নেই—আমি চলে যাব কাল।

বিপন্ন স্বরে নীরদ বলল, এই নাও। এবার বুঝি তোমার পালা। সমস্ত ঠিক্ঠাক হয়ে যাবে, একটা দিন ক্ষমা দে ভাই।

পরের দিন নীরদ যত্ন করে কাগজপত্র সব পড়ল, অনেকক্ষণ ভাবল, তিন-চার ছিলিম তামাক পুড়ল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলে গেল। সুধানাথ বাইরের ঘরে একটি চেয়ারে স্থাণু হয়ে বসে আছে, এবং জানালা দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে স্বভাবের শোভা দেখছে। আরও অনেক পরে নীরদ এসে বলল, ব্যাপার সঙিন। খুব ভরসা দিতে পারি নে ভাই।

অন্যমনস্ক সুধানাথ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, সদরের কথা বলছ?

সদর অন্দর দুই-ই। অবহেলা করে বিষম জট পাকিয়ে

ফেলেছ। হার হয় কি জিত হয়, কোর্ট থেকে না-আসা অবধি বলা যাচ্ছে না কিছু।

নীরদ বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই সুধানাথের অস্বাভাবিক চিৎকার শোনা গেল, বউদি। বউদি।

যে যেখানে ছিল—ছুটে এসে দেখে, দালানের বিছানায় সে এলিয়ে পড়ে আছে। পায়ের এক জায়গায় রুমাল দিয়ে বাঁধা। লীলার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে সুধানাথ বলল, দেখছ কি বউদি, মা-মনসা ঠুকে দিয়েছেন। চললাম এবার।

ব্যাকুল হয়ে লীলা কেঁদেই ফেলল। দুর্গারও শুষ্ক শঙ্কাচ্ছন্ন মুখ। এগিয়ে ক্ষতস্থান দেখতে লাগল। কালীপদ ছুটল যোগীন-ওঝার বাড়ি। খানিক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে দুর্গা একটু সরে এসে দাঁড়াল। মুখের মেঘ তখন কেটেছে, দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লীলা প্রশ্ন করল, কি ?

দুর্গা বলল, বেশি কিছু নয়, আমি পারব। যোগীন-ওঝার দরকার নেই।

রোগী একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল। সে বলল, আপনি পারবেন কি রকম ? ডাক্তারিও জানা আছে নাকি ?

লীলা বলল, কোথায়! ফার্স্ট-এড শিখবার সময় বুঝি একটু-আধটু…না, না—সে কোন কাজের কথা নয়। কালীপদ ফিরে এলে সদরে পাঠাচ্ছি—ভাল ডাক্তার নিয়ে উনি চলে আসুন। ভাল মানুষ বেড়াতে এসে কি যে হল—আমার তো গা কাঁপছে—

দুর্গা এবার খিল-খিল করে হেসে উঠল।

কিচ্ছু ভাবনা নেই দিদি, সদরে ছুটোছুটির দরকার নেই—আমার কথা শোন। যে সাপে কামড়েছে—দাগ দেখে বুঝছি, তার ফণা নেই।

সুধানাথও সমর্থন করল, না, না—সদরের ডাক্তার এসে কি করবে? আমারও যেন মনে হচ্ছে, ঢোঁড়া সাপ। সেই রকমই দেখেছি।

ইতিমধ্যে কালীপদ যোগীন-ওঝাকে নিয়ে এসেছে। দুর্গা হুকুমের সুরে বলল—মন্তোর-তন্তোর তোমার পরে হবে ওঝা-মশাই। বাঁধন মোটে একটা হয়েছে, কষে আরও দু-তিনটা দাও। আমি সাপের ডাক্তারি পাশ করে এসেছি—বুঝলে?

ওঝা সসম্ভ্রমে দুর্গার দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধন দিতে প্রবৃত্ত হল। দুর্গা ঘাড় নাড়ে, ও ঠিক হয় নি। আরও—আরও জোরে। যোগীন আর কালীপদ প্রাণপণ বলে দড়ি কষতে শুরু করে। আর্ত কণ্ঠে সুধানাথ বলল, বউদি, সাপের বিষে প্রাণ না-ও যদি যেত, বাঁধনের চোটে যাবে নিশ্চয়।

লীলা কিন্তু এবার এদের দলে। বলল, বিষ ওপরে না ওঠে, সেটা আগে দেখতে হবে। হ্যাঁ রে দুগ্‌গা, এবার হয়েছে—না? তুমি চোখ বুজে শুয়ে থাক ভাই—

দুর্গা পরীক্ষা করে খুশি মুখে ঘাড় নাড়ল। তারপর যোগীনকে বলল, এবার না হয় তোমার চিকিৎসাই চলুক ওঝা-মশাই। দরকার হলে আমি পরে দেখব।

যোগীন অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়ল, অনেকগুলো শিকড় এনে সুধার পায়ে বুলাল, শেষে ক্ষতের মুখে মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত চুষে ফেলে

বলল, ঠিক বলেছ ঠাকরুন, বিষ নেই। এবার খুলে দেওয়া হোক। তবে নজর রেখো, রোগী যেন ঘুমোন না।

বাঁধন খুলে আর একবার সকলকে সাবধান থাকতে বলে যোগীন বিদায় হল। সুধানাথের পা যেন অসাড় হয়ে গেছে। এদিকে ছেলে কাঁদছে, লীলা যেতে যেতে বলল, তুই কোথাও যাসনে দুগ্‌গা···আর দেখবি, ঠাকুরপো ঘুমোয় না যেন।
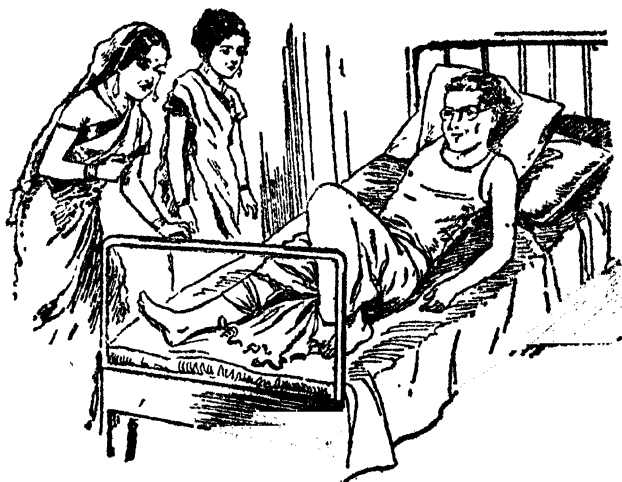
—আর দেখবি, ঠাকুরপো ঘুমোয় না যেন।

দুর্গা হেসে ফেলে বলল, তা পারব। খুব—খু-উ-ব পারব।

সুধানাথও বলল, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান বউদি, তা উনি খুব পারবেন। এক্ষুণি এমন ঝগড়া শুরু করবেন যে ঘুম ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না।

বউদিদি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

দুর্গা বলল, ঝগড়া করতে যাব কোন্ দুঃখে? চিমটি কাটতে হয়—পচা আমানি খাওয়াতে হয়—দরকার হলে আরও গুরুতর অনেক-কিছু প্রয়োগ করবার বিধান আছে। সাপের কামড়ের ঐ ব্যবস্থা।

আজ্ঞে না। সুধানাথ মহাবেগে প্রতিবাদ করে উঠল। ওটা ভূতে-পাওয়ার ব্যবস্থা, সর্পাঘাতের নয়। আপনার ফার্স্ট-এডের যত বড় সার্টিফিকেটই থাকুক, এ কথা আমি এক-শ বার বলব।

দুর্গা বলল, তা হলে খুলে বলি, আপনাকে ভূতেই পেয়েছে। সর্পাঘাত মিছে কথা।

মিছে কথা?

হ্যাঁ। এবং ইচ্ছে করে লোক ঠকানো। তার মানে জুয়োচুরি। সাপের দাঁতের দাগ ও নয়।

তাই যদিই হয়—সাপ অবশ্য আমি চোখে দেখি নি—ধরুন, শামুকে কাটতে পারে, কাঁটার খোঁচা লাগতে পারে, কত কি হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করে জুয়োচুরি করেছি—তার প্রমাণ কি?

ওটা ক্ষুরে কাটা। আপনারই দাড়ি-কামানো ক্ষুর—

সুধানাথ তর্ক ছাড়ে না। তাই-ই যদি হয়—ক্ষুরে অজান্তেও কাটতে-পারে। আমার দোষ কি?

দোষ আপনার নয়, ঘাড়ের ভূতটার। দাড়ি কামাচ্ছিলেন, সে-ই সম্ভবত মতলব দিয়েছে পায়ে ক্ষুর বসিয়ে দেবার। ভাবলেন, রক্তপাতের ফলে হয় তো সুরাহা হয়ে যাবে। এটা ভাল কথা নয়।

সুধানাথ বলল, কি ভাল নয়? ভূত, না ক্ষুর বসানো?

ছুঁই-ই। জানেন, কত সহজে সেপটিক হয়ে যেতে পারে! নিজের পায়ে ক্ষুর বসালেন, আপনি ডাকাত!

চোর, জুয়োচোর, ভূতগ্রস্ত এবং ডাকাত। ভূত তাড়াবার জন্য আপাতত চিমটি ও পচা-আমানি···প্রয়োজন-মাফিক আরও গুরুতর ব্যবস্থা। রোগ-নির্ণয় এবং চিকিৎসায় আপনার জুড়ি নেই, এ-কথা মানতে হবে।

যশ-গৌরব মেয়েটি অতি সহজে হজম করে নিতে পারে। বড় বড় চোখ মেলে সে বলল, তা ঠিক। সবাই ওকথা বলে থাকে। নইলে ফার্স্টক্লাস সার্টিফিকেট পাওয়া যায় কখনও?

একটু চুপ করে থেকে সুধানাথ বলল, আচ্ছা, মানলাম ভূত। কিন্তু ভূত তাড়াতেই হবে, এই কি আপনার ইচ্ছা?

দুর্গা মৃদু হেসে বলল, তা ছাড়া উপায় কি বলুন। ভদ্রলোকের ছেলে কুটুম্বের বাড়ি এসে এই বিপদ। এঁদের কর্তব্যই তো আপনাকে নিরাময় করে তোলা।

ওঁদের কথা জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাস্য আপনার বিষয়ে। আচ্ছা দুর্গারাণী, হস্টেলে থাকেন—ঝগড়া করেন কার সঙ্গে? মেয়েতে মেয়েতে সুবিধে হয় কি? সেখানে তো শুনেছি, সহজে জেতা যায় না।

দুর্গা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, পুরুষেরই বা অভাবটা কি! ভ্যাবলা বলে চাকর আছে একটা—

এমন তো হতে পারে, ভ্যাবলার চাকরি থাকল না। কিম্বা ধরুন, সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল। চাকর বই তো নয়!

তা হলেও ঠাকুর আছে। তার নাম হনুমানপ্রসাদ। চলে যায়

এক রকম। অসুবিধে যা-কিছু, কেমিস্ট্রির টাস্‌ক নিয়ে—ফর্মুলা দেখলেই কেমন মাথা গোলমাল হয়ে যায়।

তবেই দেখুন, মুশকিল কত! একদৃষ্টে ক্ষণকাল দুর্গার দিকে চেয়ে সুধানাথ কি দেখল কে জানে! মৃদুভাবে একটু হেসে বলতে লাগল, আচ্ছা—বিবেচনা করা যাক, যদি উৎকৃষ্টতর কোন ব্যবস্থা করা যায়! অর্থাৎ ঝগড়া করবার এবং গালি খাবার উপযুক্ত এক ভদ্রলোক অহরহ যদি উপস্থিত থাকেন এবং কেমিস্ট্রি-জাতীয় নীরস টাস্‌ক কোন কিছু না থাকে।

দুর্গারাণী প্রতিবাদ করে উঠল, কিন্তু সেই লোকটির ভদ্রতা সম্বন্ধে গোড়াতেই আমার আপত্তি।

লোকটির সম্বন্ধে নয় তো? তা হলেই হল। এবার মূল-প্রস্তাব বিচার করুন।

দুর্গা রাগ করে বলল, ভূত আপনাকে প্রলাপ বকাচ্ছে।

সুধানাথ নাছোড়বান্দা। বলল, প্রশ্নের কিন্তু জবাব হল না দুর্গাদেবী।

আপনি বড্ড বেহায়া। যা-তা বলেন। মহিলার সম্ভ্রমজ্ঞান নেই।

সে পরিচয় প্রথম দিনই হয়ে গেছে। শাস্তিভোগও চলেছে। মায় রক্তপাত অবধি। এই রকম শাস্তি জীবনান্ত অবধি চলুক, এই আরজি।

এবার দুর্গা হঠাৎ হেসে ফেলল। বলে, নাঃ—আপনার ভয়ানক দুঃসাহস। বাস্তবিক কি জন্য পায়ে ক্ষুর বসালেন বলুন তো।

বলব তা হলে? সত্যি বলব? সুধানাথ দুর্গার দিকে চেয়ে টিপিটিপি হাসতে লাগল। তারপর বলল, আমার সন্দেহ হল, ক্ষুর পায়ে না বসালে আর একজন হয় তো গলায় বসাবেন।...ও কি দুর্গারাণী,

চললেন যে, আমার কিন্তু ঘুম আসতে পারে। জানেন তো, ওঝা কি বলে গেল। এমনই এখন থেকে মাথা ঝিমঝিম করতে লেগেছে।

দৃক্‌পাত না করে দুর্গা বেরিয়ে গেল। আবার দু-পা ফিরে এসে দরজায় মুখ বাড়িয়ে হাসতে বলল, সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। চা নিয়ে আসছি—

হাতে ধূমায়মান চা। সেটা নামিয়ে রেখে কৈফিয়তের ভাবে দুর্গা শুরু করল, আসতাম না। আপনি যা লোক…আপনার সামনে আসা ঝকমারি। নেহাৎ প্রাণের দায়—

এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে খুশি হলাম দুর্গাদেবী।

মুখ লাল করে দুর্গা বলল, সহজ কথাটা বুঝবারও বুদ্ধি নেই? প্রাণ আর কারও নয় গো মশায়,—আপনারই। যোগীন বলে গেল, আপনাকে ঘুমতে দেওয়া ঠিক নয়।

চুলোয় যাক যোগীন। রোগী বিদ্যুদ্বেগে খাটের উপর উঠে বসে দুর্গার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরল। বলল, ঘুমুতে না দেবার ব্রত নিলেন তবে? আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হোক।

জুতা মসমস করে আচম্বিতে নীরদ এসে ঢুকল।

এত সকালে?

নীরদ বলল, সকাল নয়—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখ। কিন্তু ভাই, বলব কি—ভালমানুষ হাকিম আমাদের, এবার কি হয়ে গেল—তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করল না।

সুধানাথ বলল, যাক গে। কিন্তু এদিককার হাকিমটি কড়া এবং বদমেজাজি হলেও দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

বটে! বটে! আনন্দের হাসি হেসে নীরদ বলল, আমিও

সেই রকম অনুমান করছিলাম। তোমাদের আলাপন শুনে গাঙের ঘাট থেকে মনে হল, লাঠালাঠি হচ্ছে। এসে দেখি মুখোমুখি বসে— এবং লাঠি নেই অতএব প্রেমালাপ না হয়ে যায় না।

নেহাৎ ভালমানুষের ভাবে সুধানাথ বলল, ঠিক তাই। দুর্গারাণী বললেন, এস ভবিষ্যতের রিহার্শালটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক। আমি বললাম, শুভস্য শীঘ্রম্—

দুর্গা বলল, আপনি এমন মিথ্যুক! ছি, ছি, আমি চললাম।

নীরদ সহর্ষ কণ্ঠে বলল, না—না, তোমরা যেমন আছ—থাক, আমিই যাচ্ছি। তারপর ভিতরে যেতে যেতে বলল, ধড়াচুড়ো ছেড়ে এক্ষুণি আসছি। আর লীলাকে ধরে নিয়ে আসি, তার যে অনেক দিনের সাধ—

লিখে দিয়েছে, বন্ধটা সে হস্টেলেই কাটাবে, বাড়ি যাবে না,—কলেজ খুলেই অমনি এগজামিন···ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন অনেক দূরের কোন পূজো-বাড়ি থেকে শানাইয়ের সুর আসতে লাগল। প্রীতিলতার মনটা কেমন করে উঠল। সমস্ত বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। দোতলার দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে কেবলমাত্র যুথী, অনিমা আর আশা। নিচের তলায় জন আষ্টেক আছে বটে, তারা সব সেকেণ্ড ইয়ারের মেয়ে—তাদের সঙ্গে তেমন ভাব-সাব নেই।

প্রীতি ম্লানমুখে যুথীর ঘরে এসে দাঁড়াল। বলল, পড়ায় মোটে মন লাগে না। কি করা যায় বল তো যুথী?

যুথী বলল, আমারও না। বাড়ি চলে যাব ভাবছি।

প্রীতি বলল, আমিও।

এতক্ষণে মনে স্ফূর্তি এল। সোজা একেবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কমলা সেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললেন, যাবে কার সঙ্গে?

প্রীতি বলল, এখন তো কাকার বাড়ি যাচ্ছি। কাকিমারাও দেশে যাচ্ছেন। সবাই একসঙ্গে যাব।

প্রীতির দূর-সম্পর্কীয় এক কাকা বড় এডভোকেট। কাকিমার সঙ্গে কমলা সেনের খুব মাখামাখি। ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল।

কিন্তু কাকার বাড়ি যেতে বয়ে গেছে প্রীতির। কাকিমা দেশে যাবেন না আরো কিছু! সমস্ত মিথ্যা কথা—যা হোক বলে সে ছুটি নিয়েছে। প্রীতি সোজা শিয়ালদহে এল। আরও দু-একবার সে একা একা বাড়ি গিয়েছে। কিন্তু স্টেশনে এসে যে কাণ্ড দেখল, তাতে হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে যায়।

ইঞ্চি পাঁচেক পরিমিত এক গর্ত, তার মধ্যে অন্তত-পক্ষে খানপঞ্চাশ হাত ঢুকে আছে। আরও শ-দুই আন্দাজ লোক বাইরে প্রবল বিক্রমে মল্লযুদ্ধ চালাচ্ছে। জালের ওধারে টিকিট-বাবু টাকা-পয়সা বাজিয়ে নিয়ে হিসাব করে মন্থরভাবে এক-একখানা টিকিট দিচ্ছেন। খানিকটা দূরে এক পাহারাওয়ালা পরম আনন্দে এই রোমহর্ষক দৃশ্য উপভোগ করছে, আর মৃদু হেসে মাঝে মাঝে বলছে, আস্তে বাবুরা, পালা করে একের পর এক যান। প্রীতিলতা দেখল, এইভাবে চললে তার পালা আসবে বিজয়া-দশমীর আগে কিছুতে নয়।

একজন বয়স্ক গোছের ভদ্রলোক দেখে প্রীতি বলল, একখানা যশোরের টিকিট কিনে দেবেন দয়া করে?

সামনের কুরুক্ষেত্রের দিকে হতাশভাবে চেয়ে লোকটি বললেন, ওঁরা দয়া না করলে সাধ্য কি মা! আমি নিজেই ঘণ্টা চারেক এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

যশোরের টিকিট তো? আমি যশোর যাব, এক্ষুণি করে দিচ্ছি।

প্রীতিলতা পিছন ফিরে তাকাল। খর্বাকার এক যুবা, এক হাতে কাগজে-মোড়া এক টোপর ঝুলিয়ে নিয়েছে, আর এক হাতে প্রকাণ্ড স্যুটকেশ, তাতে বড় বড় হরপে লেখা আছে, অবিনাশচন্দ্র বাগ্‌চি। সঙ্গে এক মুটে, তার মাথায় ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কের উপরে ঝুড়ি-ভরতি নানা আয়তনের অসংখ্য জিনিসপত্র। মুটে ঘেমে গিয়েছে। বিরক্ত-কণ্ঠে বলে উঠল, থাঁট কিলাস ইধারমে কাঁহা—

—হুঁশিয়ার কিন্তু। টোপরটা হাতে নিন।

যাচ্ছি বাবা, সবুর। প্রীতির দিকে চেয়ে অবিনাশ একটু হাসল। বলল, টাকা দিন, এক টাকা সাড়ে সাত আনা। আমার থার্ড ক্লাস —আপনাকেও তাই যেতে হবে। কেন যাবেন না? মহাত্মা গান্ধী যান, আমরা কি এমন নবাব হলাম!

অবিনাশ মোটঘাট নামিয়ে এক জায়গায় জড় করল; দু'খানা

টিকিটের দাম হিসাব করে পয়সা গুণতে লাগল। বলল, ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। ভাবনা হয়েছিল, এই ভিড়ের মধ্যে মুটে যদি জিনিসপত্তোর নিয়ে চম্পট দেয়।...দাঁড়ান এখানে। হুঁশিয়ার কিন্তু। টোপরটা হাতে নিন। আহা, ভাল করে ধরুন না—চাপ লাগলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মালকোঁচা এঁটে অবিনাশ রণবেশে সজ্জিত হল। তারপর টোপর সম্বন্ধে প্রীতিকে আর একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে—ঐ তো মানুষ, সে একটা দেখবার ব্যাপার বটে, না দেখলে অনুমান করা যায় না—অবিনাশ তিড়িং করে লাফিয়ে তিন-চারটে মানুষের মাথার উপর দিয়ে এসে বুকিং-আফিসের গরাদে এঁটে ধরল। পা তখন অবধি মাটিতে পৌঁছয় নি, ঝুলছে। তারপর টিকিট মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিজেকে জনতার মধ্যে ছেড়ে দিল। ব্যস, তাকে নিয়ে খানিক যেন লোফালুফি চলল। সে গা এলিয়ে দিয়েছে। ঠেলাঠেলির চোটে আপনিই শেষে বাইরে এসে পড়ল।

টোপর ঠিক আছে তো? প্রীতির হাত থেকে টোপরটা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সে পরীক্ষা করল। বলল, আসুন।

দুই কনুই উদ্যত করে অবিনাশ ভিড়ের মধ্যে পথ করে চলল।

কামরার সামনেও সংগ্রাম চলছে। ভদ্রলোকেরা আস্তিন গুটিয়ে দ্বার রক্ষা করছেন—সূচ্যগ্র গলতে দেবেন না এই পণ। ইঞ্জিন অবধি তারা এগিয়ে গেল। সর্বত্র একই দশা! এক দরজায় প্রকাণ্ড টাকওয়ালা এক বুড়ো ভদ্রলোক। খানিকটা দূরে বেঞ্চিতে বসে জন পাঁচছয় ছোকরা বীর বিক্রমে তর্ক করছে, তাদের মধ্যে তিনজনের চোখে চশমা এবং পাঞ্জাবির বোতাম কাঁধের উপর দিয়ে। অতএব কলেজের

ছেলে না হয়ে যায় না। সেখানে গিয়ে অবিনাশ থামল। প্রীতির দিকে চেয়ে বলল, দেখুন, ঘণ্টা চারেকের জন্য আমি আপনার গার্জেন। স্বীকার করেন ?

প্রীতি ঘাড় নাড়ল। স্বীকার না করে এ অবস্থায় আর উপায় কি !

অবিনাশ দরজার দিকে চেয়ে সকাতর অনুনয় আরম্ভ করল, দেখুন, একটুখানি পথ ছেড়ে দিন। আমার জন্য বলছি না—এই এর জন্য।

টাকওয়ালা দ্বাররক্ষী অবহেলা ভরে চেয়ে রইলেন। কথা যেন তাঁর কানেই যায় নি। অবিনাশ মিনতি করতে লাগল, দোহাই আপনার, একটু সরে দাঁড়ান।

ছেলেগুলোর তর্ক থামল। তারা এইদিকে মনোযোগী হয়েছে। একজন ধাঁ করে উঠে এসে জানালায় মুখ বাড়াল।

কি বলছেন মশাই ?

অবিনাশ এতক্ষণে কূল পেয়েছে। বলল, আমরা এই দু'টি প্রাণী। পথটা একটু ছেড়ে দিতে বলুন।

ছোকরা বলল, জায়গা কোথায় ? এর পরেই একটা স্পেশ্যাল দিয়েছে, সেইটায় যাবেন, ভিড় হবে না।

অবিনাশ ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, এই গাড়িতে যাওয়া যে চাই-ই। জানালা দিয়ে ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো কৌতূহলী মুখ বেরিয়ে এসেছে। হাসিমুখে সকলের দিকে চেয়ে অবিনাশ হাতের টোপরটা উঁচু করে দেখাল।

যেন মন্ত্রের কাজ হল। চার-পাঁচজন এগিয়ে এসে দরজার ভদ্রলোককে ধমকি দিল, সরে আসুন।

টাক তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন।

জায়গা নেই, এনে বসাবেন কোথায়?

আপনার জায়গায়। মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কি রকম ভদ্রলোক আপনি?

হাত ধরে কয়েক জন বুড়োকে সরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেঞ্চির উপর সতরঞ্চি ও বালিশ পেতে এবং চারিপাশে পোঁটলাপুঁটলির বেড়া দিয়ে রীতিমতো ব্যূহ সাজিয়ে রেখেছিলেন। দুম-দাম করে সেগুলো ফেলে এবং বিছানা গুটিয়ে নবাগতদের জায়গা হল। ছোকরাদের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বুড়ো ভদ্রলোক তখন তাঁর বয়সের যে ক'টি আরোহী ছিলেন, তাঁদের দিকে চাইলেন। কিন্তু সহানুভূতি সেদিক দিয়েও এল না। একজন বললেন, যাই বলুন মশায়, অন্যায় আপনারই। আর কিছু নয়—বিয়ের লগ্ন। ধেড়ে মেয়ে, অরক্ষণীয়া অবস্থা—সেটা বুঝে দেখতে হয়?

আর একজন মন্তব্য করলেন, মেয়ের বিয়ের জ্বালা পোহাতে হয় নি বোধ হয়।

আলোচনা সমস্তই প্রীতির কানে যাচ্ছে। মুখ রাঙা হয়ে গেছে, লজ্জায় কি রাগে—বলা কঠিন। অথচ অবিনাশের উপর রাগ করা চলে না। বরঞ্চ তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সে বেচারা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তখনও মোটঘাট তুলছে। তারপর ক্লান্তভাবে ঝুপ করে সে প্রীতির পাশে বসে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি ছাড়বার দেরি কত?

ছোকরার দল উন্মুখ হয়ে আছে। একজন হাতঘড়ি দেখে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, সাড়ে সাত মিনিট।

ওঃ—বলে অবিনাশ কোঁচার কাপড়ে বাতাস খেতে লাগল। অসহ্য গরম! প্রীতির মুখেও ঘাম ফুটেছে। অবিনাশ বার দুই-তিন প্রীতির দিকে তাকাল। তারপর ছোকরাদের উদ্দেশ্যে বলল, আপনাদের কারো কাছে পাখা আছে সার?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখা গেল, অনেকটা দূরে গাড়ির অপর কোণে এক হিন্দুস্থানি বসে ঝিমুচ্ছে, হাতে হাতপাখা।• মাঝে মাঝে নাড়ছেও। হাত শিথিল হয়ে আসছে, সচকিত হয়ে আবার বারকয়েক খুব জোরে নাড়ছে। ছোকরার দল চলল সেখানে।

পাখা ধরে টান দিতেই মালিক চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসল।

পাখা দাও।

কাহে?

লেডি···দেখতা নেই?

একটু আগে টাকওয়ালা ভদ্রলোকের দুর্গতি দেখেছে, হিন্দুস্থানিটি আর কিছু বলবার ভরসা পেল না। প্রাণপণ শক্তিতে বারকয়েক বাতাস করে পাখাটা সে দিয়ে দিল।

প্রীতিলতা এতক্ষণে কথা কইল। হাত বাড়িয়ে বলল, দিন।

অবিনাশ বলল, না না—সে কি হয়?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাখা প্রীতির হাতেই পৌঁছল। সে বাতাস করছে। অবিনাশ মহানন্দে চোখ বুজে বলল, আঃ!

আবার চোখ মেলে দেখে, ছোকরারা নয়—পাশের প্রবীণ ভদ্রলোকেরাও চাপা গলায় কি আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। একজন ডাকলেন, হ্যাঁ মশাই—

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি বুঝি পড়াশুনো করে?

অবিনাশ প্রীতি ও আর সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলল, হ্যাঁ।

তখন ভদ্রলোক নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন, আমি বলেছিলাম কি না।...কিন্তু লেখাপড়া করলে কি হয়, মেয়েটি ভাল, সেবা-যত্ন করতে পারবে। ঐ বাতাস দেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি।

এতগুলো লোকের দৃষ্টি ও আলোচনার বিষয় হয়ে প্রীতি অস্বস্তি বোধ করছিল। অথচ আর কোথাও পালাবারও উপায় নেই। বেঞ্চিটা মাঝের দিকের, বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে যে দৃষ্টিবাণ থেকে রক্ষা পাবে, তার সম্ভাবনা নেই। অগত্যা হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমের ভাণ করে সে চোখ বুজল।

পায়ের দিকে যে লোকটা ছিল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল হয়ে শোন। অবিনাশ বাঙ্ক থেকে ছোটগোছের একটা পুঁটলি নামিয়ে বালিশ হিসাবে তার মাথায় গুঁজে দিল। প্রীতি আরও একটু কাত হয়ে পড়ল।

গাড়ি ছাড়ল। প্লাটফরম ছাড়িয়ে আসতে এক ঝলক বাইরের হাওয়া ঢুকল। গাড়িসুদ্ধ লোক যেন প্রাণ ফিরে পেল। অবিনাশও একটুখানি চোখ বুজেছে। তার একটা বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, দেনা-পাওনা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, অগ্রহায়ণের দিকে হবে। অবিনাশ চোখ বুজে ভাবছে, মন্দ হবে না—পরের হাতের বাতাস খাওয়া যাবে। লেভেল-ক্রসিং পার হবার মুখে রেলগাড়িও যেন বলছে, ঠিক, ঠিক—ঠিক, ঠিক। আবার ভাবল, কেবল বাতাস খেলে তো হবে না, বাতাস করাও একটু উচিত। প্রীতির হাতখানা এলিয়ে পড়েছে, হাতের পাখা মেজে

ছুঁয়ে আছে। অবিনাশ পাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল। প্রীতির গায়েও একটু-আধটু যে লাগছে না, এমন নয়।

পাশের ভদ্রলোক কনুয়ের আঘাতে অবিনাশকে আপ্যায়ন করলেন, হ্যাঁ মশাই ?

অবিনাশ চোখ মেলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কি ?

রাগ করছেন ? বিড়ি নিন।

বিড়ি ধরিয়ে অবিনাশ চাঙ্গা হয়ে বসল।

বিয়ের কথা বলছিলেন, বিয়ে এঁর বুঝি ?

অবিনাশ প্রীতির দিকে একনজর চেয়ে দেখল। চোখ বুজে নিঃসাড় হয়ে আছে, ঘুমিয়েছে নিশ্চয়।

অবাধে সে জবাব দিয়ে চলল, হুঁ।

পাত্র ?

হেসে উঠে অবিনাশ বলল,—তা-ও একজন আছে বই কি !

হাসিতে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। ছোকরা ক-জন প্রায় সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন প্রশ্ন করল, আপনি ওঁর অভিভাবক বুঝি ?

আপাতত তো বটে !

আর একটি ছোকরা বলল, তুই একটা আস্ত গাধা হরিদাস। বুঝতে পারলি নে, অভিভাবক এখনও নন, হতে যাচ্ছেন···কি বলেন মশাই, ঠিক ধরেছি কি না ?

জবাব না দিয়ে অবিনাশ আবার একটু মুখ টিপে হাসল।

প্রীতি ঘুমোয় নি। ইস্কুলে থাকতে সে ছোরা খেলত, অনেক দিন পরে তার হাত যেন নিশপিশ করতে লাগল। একখানা ছোরা পেলে

ছোকরাগুলোর এবং অবিনাশের মুণ্ডে কোপ বসিয়ে কথাবার্তা এইখানে শেষ করে দেয়। কিন্তু অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, কপট ঘুম তার এ অবস্থায় কিছুতেই ভাঙবার জো নেই।

এক্সপ্রেস গাড়ি—বেশ জোরে চলেছে। গাড়ির লোক চুপচাপ হয়ে গেছে। অনেকগুলো স্টেশন ছাড়িয়ে বারাসতে এসে গাড়ি থামল। ছোকরার দলটি এইখানে নামবে।

একজন অবিনাশকে নমস্কার করল। বলল, শুভ কাজ শিগগির হয়ে যাচ্ছে, আশা করি—

অবিনাশ সংক্ষেপে জবাব দিল, অঘ্রাণে।

আর একজন বলল, বিয়ের পর সস্ত্রীক গাড়ি চড়ে তো সবাই! আপনারা বিয়ের আগে। কনগ্রাচুলেশন—একশো বার কনগ্রাচুলেশন—

ছোকরাদের পিছনে আরও অনেকে নেমে গেল। সমস্ত বেঞ্চি-খানাই প্রায় খালি। প্রীতিলতা চোখ মেলে উঠে বসল।

অবিনাশ হাঁ-হাঁ করে উঠল। করছেন কি? শুয়ে পড়ুন। এক্ষুণি আর একদল এসে বসে পড়বে। কাল সুতোপাটিতে রাত কেটেছে, ছারপোকার কামড়ে চোখ বুজতে পারি নি। আমারও শোবার দরকার।

প্রীতি বলল, বেশ তো, এই জায়গায় শুয়ে পড়ুন। আমি বসে থাকব।

শুয়ে থাকতে দেবে বুঝি? পঙ্গপালের দল খোঁচা মেরে টেনে তুলবে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, এই রাস্তাটুকুর জন্য অভিভাবক আমি। কথা তো হয়ে গেছে। যা বলি আপনার করা উচিত। এখানে শুয়ে পড়ুন।

প্রীতি জবাব দিল না, বিরক্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে রইল।

অবিনাশের স্বর এবার রীতিমতো ঝাঁঝাল হয়ে উঠল। বলল, তা জানি, আপনারা ঐ রকম। আচ্ছা, কৃতজ্ঞতা বলেও কি একটা জিনিস নেই? মোটে টিকিট করতে পারছিলেন না, জায়গা হচ্ছিল না—এত পথ দিব্যি শুইয়ে নিয়ে এলাম, শুইয়ে বাতাস করতে করতে নিয়ে এলাম।

হঠাৎ কাতর হয়ে বলতে লাগল, শুয়ে পড়ুন দিকি, দোহাই আপনার। নইলে বনগাঁয় গিয়ে বুঝবেন ব্যাপারটা। যত নেমেছে তার ডবল উঠবে। কচ্ছপের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে যেতে হবে। কেন, তার দরকারটা কি?

এর পর আর কথা না শুনে চলে না। বেঞ্চির অপর দিকটায় অবিনাশও শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার কান খাড়া আছে। গাড়ি গোবরডাঙা-পুলের উপর উঠতে সে উঠে বসল। পুঁটলি খুলে ধাঁ করে একখানা নূতন চাদর বের করল। প্রীতিকে বলল, প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রয়েছেন যে বড়! বনগাঁয় এসে গেল—চাদরটা মুড়ি দিয়ে ফেলুন এইবার!...দেখুন, পথঘাট আপনারা তো তেমন চলেন না—যা বলি শুনুন। দিব্যি শান্তিতে যাওয়া যাবে।...হ্যাঁ—আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে অসাড় হয়ে থাকবেন। স্টেশন ছেড়ে গেলে একটু-আধটু বরং চোখ চাইতে পারেন, কিন্তু স্টেশন থাকতে—খবরদার!

বিরক্তি গিয়ে এখন প্রীতির মজা লাগছে। ওস্তাদ লোক, দেখা যাক আবার কি মতলব করেছে। হিন্দুস্থানিটি কোণ থেকে তাকাচ্ছিল। অপর বেঞ্চিতে কয়েকজন নবাগত যাত্রী। প্রীতিলতা বিনা প্রতিবাদে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অবিনাশ সত্যাই বহুদর্শী—যা বলেছে, বর্ণে বর্ণে মিলে গেল।

স্টেশনের এক রশি আগে থাকতে কানে গেল বিপুল কলরব। গাড়ি না থামতেই ঘড়াং করে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বোঝাই। দুমদাম করে মোট ফেলছে। বেঞ্চে জায়গা নেই—অনেকে মেজের উপর বসে পড়েছে। উপরের বাঙ্কও ভর্তি, তবু অন্তত জন দশেক ঐখানে একটু স্থান পাবার আশায় বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে।

অবিনাশের দৃষ্টি এসব কোন দিকে নেই। ইতিমধ্যে হাতপাখাটা নিয়ে প্রীতির শিয়রে বসে সে মনোযোগের সঙ্গে বাতাস করতে লেগেছে। হঠাৎ পাখা রেখে সে উঠে দাঁড়াল। হাতজোড় করে করুণকণ্ঠে সকলকে বলতে লাগল, দেখুন, দয়া করে চেঁচামেচি করবেন না। আমার বড্ড বিপদ। এই এতক্ষণ ছটফট করে একটু-খানি সবে ঘুমিয়েছে। মা শীতলার অনুগ্রহ—জানেন তো কি যন্ত্রণা!

পাঁচ-সাত জনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

বসন্ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড্ড সাংঘাতিক। মাছি পড়বে, সেই ভয়ে ঢেকে দিয়েছি। খুললে দেখতে পেতেন, কি রকম গুটি বেরিয়েছে।

আর কোথায় যাবে, যারা ছিল বাঙ্কে এক লাফে তারা নিচে নেমে পড়ল, যারা মেজেয় ছিল, উঠে দাঁড়াল, বেঞ্চির লোকদের তো কথাই নেই! জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে নেমে যাবার জন্য সবাই ব্যস্ত, রীতিমতো মারামারি ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়ে গেছে।

প্রীতিলতার হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়েছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে খুক-খুক শব্দ করছে, সর্বাঙ্গ হাসির তরঙ্গে আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে। অবিনাশ বলে উঠল, আ-হা-হা, আবার কাশির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কাশতে কাশতে দম আটকে যাচ্ছে।

স্টেশন ছাড়বার আগেই কামরা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু হলে অবিনাশ বলল, আর ভিড় হবে না, এবার উঠতে পারেন।

কিন্তু প্রীতিলতা উঠল না, যেন সে শুনতেই পায়নি। সে ভাবছিল, সত্যিই যদি তার ভয়ানক একটা অসুখ করে—পথে-ঘাটে এমন কত লোকেরই হয়ে থাকে—অবিনাশ কক্ষণো তাকে ফেলে যেতে পারবে না। বড্ড মজা হয় তা হলে…এই রকম বাতাস করতে করতে সমস্ত পথ তাকে যেতে হবে, প্রীতিদের বাড়িতেও যেতে হবে, টোপর নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া ঘটবে না। আবার ভাবল, পথে এই রকম একা একা বেরুনো ঠিক নয়—সত্যি সত্যি অসুখও তো হতে পারে!

অবিনাশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বলল, কই, নড়বার নামও করেন না যে! আমার চাদরটা দিন দয়া করে। নতুন চাদর ময়লা করে ফেলবেন—

চাদরের তলা থেকে প্রীতি মুখ বের করল। হাসিমুখ। বলল, কত দাম পড়েছে এটার? অনেকদিন থেকে এই রকম একটা কিনব ভাবছি। আপনার যদি তেমন দরকার না থাকে—

বা রে! দরকার না থাকলে কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে যায়? অবিনাশ চটে উঠল। দিন, দিন আমি এ বেচব না। বড়বাজারে ঢের পাওয়া যাবে তেজিমল-আগরমলের দোকানে।

প্রীতি বলল, আমার বড্ড পছন্দ হয়ে গেছে।

অবিনাশ বলল, দোকানে যাবেন—যেটা দেখবেন, সেইটেই পছন্দ হয়ে যাবে। সে জন্য ভাববেন না। পছন্দ হওয়া আপনাদের দস্তুর।… কিন্তু আর দেরি নয়, উঠে বসতে হবে। বোচকা গুছিয়ে ফেলি, যশোর এসে গেল যে—

প্রীতি দিব্য নির্বিকার হয়ে শুয়ে আছে, কানে যেন কথাই যায় নি!
অবিনাশ ওদিকে বিব্রত হয়ে উঠেছে। বলল, নাঃ, আপনাদের মতলব বোঝা ভার। শেষকালে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হবে—এটা নিতে ওটা ফেলে যাব—

প্রীতি বলল, আমি খুব ভাল গোছাতে জানি। প্লাটফরমে নেমে সব জিনিস ঠিকঠাক গুছিয়ে দেব।

অবিনাশ ভ্রূকুটি করে বলল, হুঁ—আর ওদিকে বাস ছেড়ে দিক, তখন সমস্ত রাত স্টেশনে পড়ে মশা তাড়াই—

প্রীতি বলল, স্টেশনে থাকবেন কেন? আমাদের বাড়ি দড়াটানায়, ঘোড়ার গাড়িতে মিনিট দশেক লাগবে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আপনি যা করেছেন—মা শুনে আমায় গালাগালি দেবেন, আপনার পরে কিন্তু খুব খুশি হবেন—

অবিনাশ অধীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, না না—সে হবে না। তা হলে তো আরও কিছু সওদা করে পরের গাড়িতে যেতে পারতাম। আপনি উঠুন—উঠুন—আমার দেরি করবার জো নেই।

দুম-দাম করে বাক্সের জিনিসপত্র নামিয়ে অবিনাশ গোছাতে লাগল। প্রীতির ইচ্ছা হচ্ছিল, সাহায্য করে। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল। অলস দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল।

হঠাৎ প্রশ্ন করল, দেরি করবার জো নেই কেন? বিয়ে কি আপনাদের বাড়িতে? প্রশ্নটা ছিল—বিয়ে তারই কি না, কিন্তু অশোভন হবে বলে সেটা বলা গেল না।

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

বিয়ে? কে বললে বিয়ে?

আপনিই তো।

ভ্রূকুঞ্চিত করে একটুখানি সে ভাবল। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, ওঃ, শিয়ালদহে বলেছিলাম বুঝি! দায়ে পড়লে কি না বলতে হয়। বিয়ে না হাতী। টোপর আমার দোকানের মাল। অঘ্রাণ পড়লেই লগনসা শুরু হবে। তখন কি আবার গস্ত করতে আসব?

মুটেব মাথায় চাপিয়েছে বড় ট্রাঙ্কটা। যশোহরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মুটে—ট্রাঙ্কের ভারে মাথাটা তার হাতখানেক নুয়ে পড়ল। স্যুটকেশটা অবিনাশ হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে, আরও পাঁচ-সাতটা পোঁটলা-পুঁটলি নানা কৌশলে এখানে-সেখানে নিয়েছে। প্রীতিকে বলল, নিন না একটা, আপনার তো হাত খালি। মহাত্মা গান্ধী নিজে চরকা কাটতে পারেন, আর একটা মোট হাতে নিলে আপনার অপমান হবে নাকি?

আগে আগে চলেছে মুটে, তারপর অবিনাশ, সকলের পিছনে প্রীতিলতা। প্রীতি সভয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, স্টেশনে তার জানাশোনা কেউ নেই তো! অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তারা যে নিঃসম্পর্কীয়, একেবারে পথের আলাপি—এ কেউ ভাবতে পারে না।

টিকিট-কালেক্টর ট্রাঙ্কের উপর থাবা মেরে বললেন, কি আছে এতে? ওজনটা দেখতে চাই মশায়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কেন মিথ্যে হয়রান করেন! মেয়েদের বাক্সে থাকবে আর কি হাতি-ঘোড়া? দু-এক শিশি আলতা, কি গন্ধ-তেল, কি দু-একটা সেমিজ-ব্লাউজ। সমস্ত দিন ওর খাওয়া হয় নি—দেখুন না চেয়ে অবস্থাটা। এখন তাড়াতাড়ি কোন গতিকে পৌছতে পারলে বাঁচি।

টিকিট-কালেক্টর প্রীতির ক্লান্ত মুখের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন, আর কিছু বললেন না।

বেরিয়ে এসে অবিনাশ হি-হি করে হাসতে লাগল। বলল, হাতী-ঘোড়া নেই বটে—হাতা-বেড়ি লোহা-লক্কড়ে বোঝাই। নিদেনপক্ষে দেড় মণের ধাক্কা। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বাক্সে পুরেছিলাম, আর ভাগ্যিস আপনি সঙ্গে জুটেছিলেন—নইলে পার করে আনা মুশকিল হত।

প্রীতি অন্য কথা ভাবছিল। সে বলল, যাই বলুন, আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। একটা গাড়ি করে চলুন আমাদের বাড়ি। ক্লান্ত হয়েছেন, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে কালকে তারপর—

উঁহু। অবিনাশ প্রীতির হাতের বোঁচকাটা কনুয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল।

পিছন থেকে আবার অনুরোধ এল, একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়ে যান তবে—

উ-ই কত রয়েছে, নিন না দেখে একটা।

আঙুল দিয়ে অপেক্ষমান গাড়িগুলি দেখিয়ে দিয়ে অবিনাশ হন-হন করে ছুটেছে।

প্রীতির রাগের সীমা রইল না। বলল, লোহা-লক্কড় পার করবার জন্য আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন নাকি? অত যত্ন তাই বুঝি!

অবিনাশ বলল, আজ্ঞে না। কেবল লোহা-লক্কড় কেন—আমাকেই বুঝি আসতে দিত। দিব্যি শুয়ে বসে এলাম।...নমস্কার! কোটচাঁদপুরের দিকে যদি কখন যাওয়া হয়, আমার দশকর্ম-ভাণ্ডারে পায়ের ধুলো দেবেন একবার। ওরে বেটা, পা চালিয়ে চল—হন দিচ্ছে।

মুটেকে তাড়া দিয়ে অবিনাশ আগে আগে বাসের দিকে ছুটল।

নৌকাবিলাপ

ঘাটে নৌকা। সতীশ মহা তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে, ও মাসিমা, এখনও হল না? যেতে যেতে বর এসে যাবে যে!

গিন্নি তাড়াতাড়ি দালানে ঢুকলেন। পথের সম্বল কিছু পান-সুপারি বেঁধে নিতে হবে। গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড! খাটের উপর একরাশ কাপড় চোপড় ছড়ানো, অনুপমা তার মাঝখানে চুপচাপ বসে আছে।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখতে অনু ঝুপ করে উপুড় হয়ে পড়ল।

যাবি নে?

অনুপমা ঘাড় নাড়ল।

অথচ ঘণ্টাখানেক আগে সে এখানে এসেছে, তখন তার এ মত ছিল না। এ খেয়ালি মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ির মধ্যে জোর খাটাতে পারেন এক কর্তা। তিনি আজ চারদিন বাড়ি-ছাড়া, বিয়ে-বাড়ীর কন্যা-কর্তা হয়ে বসেছেন।

সতীশ এসে বলল, অনু, তোর মতলবটা কি, বল দিকি।

মাথা ধরেছে।

তা হলে এক্ষুণি উঠে নৌকোয় যা। গাঙের হাওয়ায় মাথা ছেড়ে দেবে।

অনুপমা সে কথার জবাব দিল না; মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আর দেরি কোরো না মা, তোমরা চলে যাও।

হুকুমের সুর, এর উপর কিছু বলা যায় না; কোনদিন গিন্নি বলেনও না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যে মোটেই সামান্য নয়। একটু ইতস্তত করে তাই একবার শেষ চেষ্টা করলেন, তুই চল্, নয় তো আমি যাব না।

অনু শান্ত স্বরে বলল, মাথা ধরেছে, এখনি হয় তো জ্বর আসবে। সেখানে গিয়ে একটা গোলমাল ঘটিয়ে বসব—সে কি ঠিক হবে? তুমি চলে যাও মা, মালতীর বিয়ে···না গেলে চলে কখনও—ছিঃ!

সতীশ ব্যথিত স্বরে বলল, তুমি যাচ্ছ না অনু, মালতী কিন্তু এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা বলবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কথাটা ঠিক, মালতী বড় দুঃখ পাবে। এই বছর দুই আগে তার বিয়ের দিন মালতী কত আমোদ-আহ্লাদ করেছিল, কবিতা ছাপিয়েছিল, হেসে ঠাট্টা করে তর্ক করে সে-মানুষটিকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। অনুপমার চোখে জল আসবার মতো হল। চমৎকার লোক কিন্তু যা হোক—দিব্যি নির্বিকার ভাবে কলকাতায়

বসে আছেন, অথচ দু-দু'খানা চিঠিতে বিয়ের তারিখ জানান হয়েছে, সমস্ত কথা লেখা হয়েছে, কিছু জানাতে বাকি নেই। ভরসা ছিল, নিতান্ত পক্ষে আজকের ডাকে পার্শেল এসে পড়বে। কিন্তু পিওন এসে চলে গেল। শুধু হাতে এখন সে যায় কি করে?

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে অনেক কষ্টে অনুপমা কান্না সামলাল। কাতর কণ্ঠে বলল, আমি পারছি না সতীশ-দা, সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে। যদি ভাল থাকি, একটা নৌকো নিয়ে মাধব-কাকার সঙ্গে যাব। তোমরা এখন যাও।

মাধব প্রতিবেশী—এদের বাড়ির গোমস্তা।

অগত্যা তাই ঠিক হল। মাধবকে বলে-কয়ে গিন্নি রওনা হয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুই কেটেছে। অনুপমা তেমনি শুয়ে। চোখের জল গৌর মুখের উপর শুকিয়ে আছে। একটুখানি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কে-একজন বাহুবেষ্টনে তাকে ঘিরে ফেলল। ধড়মড করে উঠে দেখে, কলকাতার আসামিটি স্বয়ং এসে হাজির।

অনুপমা মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রভাত ছাড়বার পাত্র নয়, ঘুরে অনুর সামনে গিয়েই—যেন কত ভয় পেয়ে গেছে—শশব্যস্তে আবার পিছিয়ে দাঁড়াল।

রাগ করলেও মানবে না, এইজন্যে লোকটির পরে আরও রাগ হয়। হাসলে তো এখনি একেবারে পেয়ে বসবে,—অনু অনেক কষ্টে মুখ গম্ভীর করে রইল।

মৃদুকণ্ঠে প্রভাত বলল, মাথা ছাড়ল?

কে বলেছে? তোমার কলকাতায় তারে খবর গেল বুঝি!

তারে নয়, অন্তরে। তারপর মাধব-কাকার মুখে সেটা যাচাই হয়ে গেল। একটু থেমে অনুর মুখের দিকে চেয়ে অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। বলতে লাগল, দোষ ছাপাখানার—তারা দেরি করে দিল—ডাকে পাঠান গেল না। না, না—কৈফিয়ৎ দিচ্ছি নে—ওতে দোষ কাটে না জানি, তাই তো কলেজ পালিয়ে ট্রেন ধরলাম। আবার মুশকিল কি রকম! স্টেশনের ঘাটে নৌকো নেই—এই ছ-মাইল ছুটতে ছুটতে এসেছি।

জোরে নিশ্বাস ফেলে প্রভাত চুপ করল। ঘাট থেকে হাত-মুখ ধুয়েই এসেছে, চেহারায় কথাবার্তায় বুঝবার জো নেই যে সে ক্লান্ত। কিন্তু ও-মানুষটির ধরনই ঐ রকম। অনু ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রভাত এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

ঐ দেখে নাও তোমার প্রীতি-উপহারের বাণ্ডিল…আর এই কানের দুল। ভেলভেটের কেসটি সে অনুর হাতে দিল। বলল, যাচ্ছ কোথায় গো? এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়—বিয়ের আগে পৌঁছে যাবে।

আনন্দে অনুর মুখ উদ্ভাসিত হল, রাগ-টাগ কোথায় উড়ে গেছে! বলল, যাব, ব্যস্ত হোয়ো না। কোন্ সকালে বেরিয়েছ—তোমার ঠিক ক্ষিধে পেয়েছে। পায় নি?

ঘাড় নেড়ে প্রভাত বলল, হ্যাঁ, আকণ্ঠ ক্ষিধে। তোমাকেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেতে দিচ্ছি না। জান তো, কথামালায় বলেছে, উপস্থিত ছাড়তে নেই।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে এগিয়ে এল।

অনুপমা বলে, সরো, ছি-ছি! ঐ হাসছেন ওঁরা দেখে দেখে—

অপ্রতিভ হয়ে প্রভাত চারিদিকে তাকাল।

কই? কারা?

দুষ্ট অনু ততক্ষণে দরজা অবধি চলে গেছে। দেয়ালের উপর দিকে দেখিয়ে চঞ্চল পায়ে সে বেরিয়ে গেল। দেয়ালে বিদ্যাসাগর ও দেশবন্ধুর ছবি। প্রভাত উদ্দেশে প্রণাম করল।

ক্ষুধার সম্বন্ধে প্রভাত অত্যুক্তি করে নি। ভুলোর মা লুচি ভাজছে, অনু পরিবেশন করতে লাগল। থালাটা একদম নিঃশেষ করে পুরো একটা গ্লাস জল খেয়ে তবে সে কথা কইল। বলল, কালই চলে যেতে হবে, থাকবার জো নেই।

অনুপমা ভালমানুষের মতো বলল, খাওয়ার হাঙ্গামা তো থাকল না। ভুলোর মাকে বলে যাব, বিছানা-টিছানা করে দেবে। অসুবিধে হবে না।

প্রভাত প্রশ্ন করল, বিয়ে-বাড়ি সমস্ত রাত কাটাবে নাকি?

অনুপমা বলল, হৈ-চৈয়ের মধ্যে আজ তো চোখের পাতা এক করতে দেবে না। তারপর কালকে মাসিমার চিলেকোঠা দখল করব। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি নে সেখানে।

একটু পরে অনু তৈরি হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত বলল, দেখ, একটা কথা ভাবছি—কাজ যখন হয়ে গেল, রাতে রাতে রওনা হয়ে পড়ি। অনর্থক একটা দিন কলেজ কামাই করে ফল কি?

অনুপমা মাথা দুলিয়ে সায় দিল, তা ঠিক, রবিবারের কলেজ কিছুতে কামাই করা যায় না।

বার-দিন-ক্ষণ হিসাব করে মানুষ সব সময় কথা বলে না। কিন্তু

প্রভাত ঠকবার ছেলে নয়। একটু উষ্ণভাবে বলল, যায়ই না তো! আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সমস্ত রবিবারে।

অনুপমা নিরুত্তরে জুতোজোড়া এনে প্রভাতের সামনে রাখল।

তবে এটা পরতে আজ্ঞা হোক।

তোমার সঙ্গে যাব নাকি!

হেসে উঠে অনু বলল, সেটা কি ভাল হবে? নেমন্তন্ন একলা আমার, তোমায় তো বলে নি। বিনি-নেমন্তন্নে যাওয়া—ছিঃ!

প্রভাত মন্তব্য করল, যেতে আমার বয়ে গেছে।

অনু বলল, ঘাটে সতীশ-দা আমার জন্য নৌকা নিয়ে আছেন। তোমাকে ঐখান থেকেই আর একটা ঠিক করে দেওয়া যাবে। রবিবারের ভয়ানক কলেজ—সে তো কিছুতেই কামাই করা যাবে না—

রাগে রাগে প্রভাত জুতো পরল। নিজের ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে চলল।

এটা সেটা দিয়ে অনুপমাও একটি মোট বেঁধেছে কম নয়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আবদারের সুরে বলল, বা-রে···ওটা?

প্রভাত বলল, লোকজন কেউ নেই নাকি?

কোথায়? নীলমণিকে বাবা নিয়ে গেছেন। ভুলোর মা মেয়েমানুষ—সে তো পারবে না। মাধব-কাকাকেই বা বলি কি করে?

প্রভাত বিরক্ত গলায় বলল, তবে ঘাট থেকে মাঝিরা এসে নিয়ে যাবে। মুটেগিরি করা আমার ব্যবসা নয়।

অনুপমা বলে, সমস্ত রাত ধরে তবে ঐ হোক। বললে

কেন আমায় যেতে? বিয়ে দেখে আমার কাজ নেই, আমি যাব না।

অতএব নিজের ব্যাগ বাঁ-হাতে নিয়ে, সেই বিশাল মোট টেনে তুলতে হল। দস্তুরমতো ওজন আছে। কাপড়চোপড়, বালিশ, তোষক, সতরঞ্চি—গোটা সংসার যেন সঙ্গে চলেছে।

প্রভাত বলল, মতলব কি? মাসিমার বাড়ি পাকাপাকি বসত করবে নাকি?

অনু অভয় দিল, না, বুধবার নাগাত চলে আসব। তার বেশি নয়। মাসিমার সঙ্গে সেই রকম কথা। কাজের বাড়িতে কত মানুষ-জন এসেছে—কোথায় বিছানা, কোথায় কি, আমার আবার পরের বিছানায় ঘুম হয় না তাই গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ঘাট খুব কাছেই। কিন্তু প্রভাতের মনে হতে লাগল, কত যুগ চলেছে—পথ আব ফুরোয় না বোঝার ভারে হাতের কনুই যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

অনু প্রস্তাব করল—আহা, মাথায় কর না কেন? জামাই আছ, আছ। রাতে কে দেখছে, কে-ই বা চিনবে?

তা ছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। সিল্কের পাঞ্জাবির উপর দুই কাঁধে সে দু-হাতের বোঝা চাপাল। বর্ষাকাল—রাস্তায় জল কাদা; চিকচিকে জ্যোৎস্না পড়ে কোন্‌টা জল, কোন্‌টা মাটি ঠিক করবার জো নেই। জলের উপর পাম্প-সু সমেত পা পড়ে, জল-কাদা ছিটকে উঠে মুখ-চোখ ভাসিয়ে দেয়। অনু ঠাট্টা করে ওঠে—দেখো—দেখো, বিছানায় লাগে না যেন। বিয়ে-বাড়ি কত কুটুম্ব এসেছে তারা বলবে কি?

অনেক দুঃখে ঘাটে পৌছান গেল। কিন্তু কোথায় নৌকা, কোথায় বা সতীশদা! ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে, নদীর বুকে অনেক দূর অবধি নোনা কাদাকে যেন যত্ন করে নিকিয়ে রেখেছে।

অনু বিবেচনা করে বলল—তা হলে ওঁরা ঠিক বাঁওড়ের মুখে নৌকা বেঁধে আছেন।

অতএব আবার সেই বাঁওড় অবধি। প্রকাণ্ড এক বটগাছ মাঝ-নদী পর্য্যন্ত ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে; ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। দেখা গেল, রয়েছে বটে একখানা ছোট পানসি। প্রভাত ডাকতে লাগল—মাঝি, মাঝি!

কারও সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে সে নেমে পড়ল। নৌকায় পৌছে গলুয়ের উপর বোঝা নামিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। দাঁড় বোঠে সমস্ত রয়েছে—কিন্তু মানুষ নেই।

জিজ্ঞাসা করল—এই নৌকো ত বটে?

অনু বলল—বা-রে এদ্দূর থেকে বোঝা যায় বুঝি!

বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে সে বসে পড়েছে। প্রভাত বলল—ওখানে থাকলে চলবে? আসতে হবে না?

—আলতা ধুয়ে যাবে যে?

ঝাঁজের সঙ্গে প্রভাত বলল—তবে কি করতে হবে, অনুমতি হোক!

বেহায়া অনু ফস করে বলে উঠল—হ্যাঁগো, তুমি একটু নিয়ে যাও না! একফালি জ্যোৎস্না পড়েছে তার মুখে; তরল কণ্ঠে সে বলতে

লাগল—অত বড় বোঝা দুটো নিয়ে গেলে আর আমার বেলাতেই পারবে না?

প্রভাত বোধকরি মনে মনে সেই তুলনা করে দেখল; নিরুত্তরে ফুলে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে—যেন পালকের তৈরি মানুষ—অনুকে সে স্বচ্ছন্দে কাঁধের উপর ফেলে আবার কাদায় নেমে পড়ল। মাঝামাঝি পর্যন্ত বীর-বিক্রমে এসে হঠাৎ প্রভাত থমকে দাঁড়াল।

—ফেলে দিই?

অনু ভয়ে আঁকড়ে ধরল।—না, না, পায়ে পড়ি—আমার কাপড়-চোপড় সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

—তবে কথা দাও, রাত্রেই ফিরে চলে আসবে?

অনু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ বললে শুনি নে। গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বল, যা হয় একটা কিছু বলে যেমন করে পার চলে আসবে।

এবার অনু খিল-খিল করে হেসে উঠল।—হ্যাঁ, গো মশাই, হ্যাঁ। আপনি না বললেও তাই করা হত। পদ্যগুলো মার জিম্মায় ফেলে দিয়ে তক্ষুনি আবার এই নৌকায় ফিরে আসবে। মশাইকেও তাই টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভেবেছিলাম, আগে কিছু বলব না—তা হবার জো আছে?

নৌকায় উঠে অনু সতরঞ্চি বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ল। দু-আঙুলে রগ চেপে ধরে বলল—উহু-হু—ছিঁড়ে পড়ছে মাথা। ওমা, বসে বসে কি করছ, একটু টিপে দাও না গো। বলেই আবার হেসে উঠল। আজ যেন তার কি হয়েছে, কেবলই হাসি পাচ্ছে।

প্রভাত হাসল না; চিন্তিত স্বরে বলল—কিন্তু মাথাধরা বললে।

সতীশ-দা ভুলবেন না, অন্য একটা মতলব বের কর। কোথায় সতীশ-দা?

অনুপমা বলল—বোনের বিয়ে, বাড়িতে কত কাজকর্ম—তিনি কি এখানে বসে রয়েছেন?

—বললে যে, তিনি নৌকো নিয়ে আছেন। এ পানসি কার তবে?

অনুপমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—জেলেদের কারও হবে বোধ হয়।

—চমৎকার! কিচ্ছু ঠিক নেই—এদিকে বিছানাপত্তর পেতে ঘরসংসার সাজিয়ে বসেছে।

প্রভাত চিৎকার শুরু করল—মাঝি। মাঝি!

ভাঁটার জলের কল-কল শব্দ, পাড়ের উপর ঝিঁঝির ডাক, বটের পাকা ফল খেতে এসে বাদুড় পাখা ঝটপট করছে...তা ছাড়া কোন দিকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

অনুপমা বলল—জেলেপাড়া কি এখানে? দু-ক্রোশ পথ' সমস্ত রাত চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। দরকার কি! এ রাইচরণের নৌকো। সে ভাল লোক, বাবার প্রজা—কতবার গিয়েছি এই নৌকোয়। ডাকতে হবে না, তুমি চল।

প্রভাত এবার সত্যিই চটে উঠল। হ্যাঁ, ঐটে বাকি আছে, মাঝি হয়ে নৌকো বেয়ে তোমায় নিয়ে যাই, লোকে ধন্য ধন্য করবে—

অনুপমা অনুনয়ের স্বরে বলল—তা আর কি করবে বল। উপায় ত নেই। রাত্রে কেউ দেখতে পাবে না। আড়ালে আবডালে লোকে

অমন কত কি করে থাকে। তুমি এত করলে—কলকাতা থেকে ছুটে এলে—আর মালতীর বিয়ে দেখা হবে না, তা ত হয় না।

প্রভাত কিছুতে রাজি নয়।

—তোমার মাধব কাকাকে ডাক গিয়ে। পারেন ত তিনি পৌছে দিন।

অনু বলল—তুমি জোয়ান যুবো, রোয়িং প্রাকটিশ কর, তুমি বড় দিলে—আর বুড়োমানুষ মাধব কাকা দেবেন পৌছে! জানি, যাওয়া হবে না—মাথাধবার উপর অনর্থক এই রাত্রে হাঁটাহাঁটি—

নৌকায় গলুয়ে প্রভাত চুপচাপ বসে আছে, ওদিকে ছইয়ের মধ্যে অনুপমা শুয়ে পড়েছে কি—কি করছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। খানিক পরে ঝপ্ ঝাস করে দিল বোঠের এক টান।

চারিদিক জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে। হাটখোলার দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে তা-ও পিছনে পড়ে গেল। অনুপমা বাইরে এসে বসেছে। প্রভাত বলল—কোথায় খালে ঢুকতে হবে, বলে দিও। পথ চেন ত সত্যি?

অনু বলল—খুব, খুব—এক বাঁক আগের থেকে বলে দেব। আর বলতেও হবে না—বাজনাই বলে দেবে। একটুখানি রাখ দিকি বোঠে—

মুহূর্তকাল দু-জনে উৎকর্ণ হয়ে শুনল। অনুপমা চোখ বড় বড় করে উজ্জ্বল মুখে বলল—শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে বাজনা, শোন—

অনেক দূর থেকে ঢোলের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছিল। অনু বলল—আর কি, পৌছে ত গেলাম! খুব মজা লাগছে কিন্তু—আমার

মাথাধরা ছেড়ে গেছে। আঃ, তোমার এই বোঠে বাওয়ার জ্বালায় আমি যাই কোথায়!

প্রভাত বলল—না বাইলে নৌকা চলবে কেন?

অনু রাগ করে বলে—চলে কাজ নেই! সব তাতে তুমি ব্যস্ত-বাগীশ। এত সকাল সকাল বিয়েবাড়ি গিয়ে কি করব শুনি! আস্তে চালাও—

এ প্রস্তাবে প্রভাতের খুব মত আছে। আলগোছে সে বোঠে ধরে রইল। পানসির গতি মন্থর হল।

অনুপমা বলতে লাগল—এই রকম যদি যেতে থাকি—কেবলই যেতে থাকি কেবলই যেতে থাকি—

প্রভাত বলল—তা ত হবে না। জোয়ার এলে নৌকো উল্টো-মুখো ফিরবে।

অনু জেদ ধরল—ধরো, জোয়ার যদি না-ই আসে!

অতএব জোয়ার না আসাই সাব্যস্ত। প্রভাত বলল—তা হলে বে-অব-বেঙ্গলে পড়ব—

—তারপর?

—তারপর সাগরের মাঝখানে। চারিদিকে কালো জল, কূল-কিনারা নেই, পাহাড়ের মতো ঢেউ—

—উঃ, কি চমৎকার! আহ্লাদে অনু হাততালি দিয়ে উঠল।—কেমন নাগরদোলার মতো দোলা যাবে। কি সুন্দর!

প্রভাত বলল—সুন্দর না হওয়াই সম্ভব। পানসি ভুস্ করে অথই জলে ডুব দিয়ে বসতে পারে—

—বাঃ বাঃ, তারপর?

প্রভাত বলতে লাগল—বড় বড় হাঙর, কুমীর—

অনু প্রতিবাদ করে উঠল—না, তুমি কিচ্ছু জান না। হাঙর-কুমীর না আরও কিছু! কত মণি-মুক্তো-প্রবাল সেখানে—মস্ত বড় রাজবাড়ি, সোনার পালঙ্ক—

প্রভাত বলল—বাজনা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিন্তু। এসে পড়েছি। তারপর হেসে উঠে বলল—এইবার ঠিক বল অনু, পাতালের রাজবাড়ি সোনার পালঙ্কে শুতে যাবে, না বিয়েবাড়ির বাসর জাগবে?

অনুপমা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—সত্যি, বিয়ে দেখার লোভ আমার নেই তেমন। তুমি এক কাজ করবে? আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল—মাসিমাদের ঘাটে উঠে চট করে পত্তর কাগজগুলো কারো কাছে দিয়ে এস, বাবার হাতে যেন পৌঁছে দেয়—ব্যস। তারপর নৌকোয় করে খুব ঘোরা যাবে।

কৈফিয়তের স্বরে বলতে লাগল—মানে, আর কিছু নয়…ভাবছি, অত ভিড়ের মধ্যে মাথাধরা আবার বেড়ে যাবে।…তুমি হাসছ কেন বল ত? মিছে কথা বলছি নাকি?

প্রভাত ঘাড় নেড়ে বলে হাসি নি ত। কি সর্বনাশ—হাসি কোথায় দেখলে? ঠিক কথাই বলেছ—নৌকোয় বেড়ানো শিরঃপীড়ার ভাল অষুধ।…কিন্তু পত্ত দিতে গিয়ে আমায় যদি ও-বাড়ির কেউ চিনে ফেলে—তখন?

অনু বলল—আর আমিও একলাটি বুঝি নৌকোয় বসে থাকব! যা আমার ভয়…হি-হি-হি—

তারপর বলল—যাচ্ছ কোথায় গো? ডাইনে ঘোরাও…এই যে খাল—খালের জল নদীতে পড়ছে, উজান ঠেলে নৌকা উঠবে। অনু ধাঁ

করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লগি হাতে উঠে দাঁড়াল। বলল—একা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না, নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে দাও এইবার।

প্রভাত সকাতরে বলল—ও মূর্তি দেখে আমারই মাথা ঘুরে পড়বার জোগাড়—নৌকো ঘুরোব কি? স্থিরো ভব, অনু লক্ষ্মীটী—

ষষ্ঠীর চাঁদ উঁচু বাঁধের আড়ালে ঢ'লে পড়ল। আবছা আঁধারে চারিদিকে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জোয়ারে খালের জল কূলের উপর অল্প অল্প আঘাত দিতে শুরু করেছে। দু-জনে কত গল্প চলেছে, গল্পের শেষ নেই।

মাঝে প্রভাত একবার বলে উঠল—ঠিক যাচ্ছি ত?

—অনু বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ যে বাজনা—

—কিন্তু আঁধার হয়ে পড়ল যে!

অনু বলল—ফেরবার সময় একটা আলো জোগাড় করে আনতে হবে।

জোয়ারের জল ফেঁপে উঠেছে, চেঁচো ও শোলার জঙ্গলের মধ্যে খালের সীমা মিলিয়ে আসছে। সেই জঙ্গলের দিক থেকে একটা তালেব ডোঙা সন-সন করে বেরিয়ে এল। ডোঙার লোক হাঁক দিল—কারা?

—বিয়ে-বাড়ি যাচ্ছি।

কিছু না বলে ডোঙা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রভাত সন্দিগ্ধ ভাবে বলল—এত সময় ত লাগবার কথা নয়।

অনুপমা বলল—আর ত এসে গেছি। বিলটা ছাড়িয়ে সারি সারি তিনটে তালগাছ—মাসিমাদের ঘাট সেই খানটায়।

চলেছে—চলেছে—তালগাছ আর আসে না। রাত কত হয়েছে,

কে জানে ? অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। প্রভাত হাত-ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করল, নজরে এল না। ক্লান্ত হয়ে সে বোঠে রেখে দিল।

—নিশ্চয় ভুল পথে এসেছি। কোথায় ঘাট ? ধানবনে এসে পড়েছি হে।

অনুপমা বলল—ঐ যে ঢোল বাজছে।

বিরক্তির স্বরে প্রভাত বলল—ঢোল কেবল তোমার মাসিমার বাড়ি বাজছে, তা ত নয়। আজ বিয়ের দিন—বিয়ে আরও কত জায়গায় হচ্ছে। তিন চার ঘণ্টা বেয়ে মরছি—বিলের শেষ হয় না, এ কি রকম ?

শুনে অনুর গা ছমছম করে উঠল। শুকনো মুখে বলল—তা হলে গ্রাম যে দিকে, সেই মুখো চালাও। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাবে।

অনেক দূরে অস্পষ্ট আলোর রেখা। সেই আলো লক্ষ্য করে প্রভাত প্রাণপণে লগি ঠেলতে লাগল। খাল আর নেই—একগলা ধানবন। তারই মধ্য দিয়ে চলল। আরও খানিক গিয়ে নৌকো আর নড়ে না। কাদায় আটকে গেছে, লগি বসে যায়, জোর পাওয়া যায় না।

অনুপমা বলল—ডাকাতের বিলে এসে পড়ি নি ত ?

প্রভাত নামল—একটু একটু জল আছে ; জল কাদায় প্রায় কোমর অবধি ডুবে গেল। কুয়োর মধ্যে পাট পচছে, দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকা টেনে চলেছে—কিন্তু কোথায় গ্রাম, কোথায় বা খাল।

দূরে আবার খট-খট শব্দ পাওয়া গেল ; লগি ঠেলে ডোঙা বা নৌকা নিয়ে কেউ চলেছে। প্রভাত চেঁচিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করবে,

কিন্তু তার আগেই অনু খুব ব্যাকুল হয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে তাকে নৌকায় তুলে নিল।

—ব্যাপার কি?

অনু বলে—চুপ, চুপ! কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগল—ঠিক ডাকাতের বিলে এসে পড়েছি। বড্ড ভয়ানক জায়গা। মানুষ মেরে কাদার নিচে পুঁতে রাখে। আমার গায়ে গয়না রয়েছে—

চোখের জল হঠাৎ ঝর-ঝর করে গড়িয়ে পড়ল। নিঃশব্দে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইল। ধানবনের মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে—কিন্তু পাছে শব্দ হয়, নড়াচড়ার জো নেই। মাথার উপর তারা ঝিলমিল করছে। এক-এক বার জোরে হাওয়া দেয়, ধানগাছ খস-খস করে, ...শত-সহস্র মানুষ যেন চুপি-চুপি কথা বলে ওঠে। ডাকাতের বিলের অনেক গল্প অনু আশৈশব শুনে এসেছে...হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে এখানে—কত শিশু, কত বুড়ো, কত কুলবধূ! নিশুতি রাতে ধানবনের মধ্য দিয়া কঙ্কালগুলো যদি একের পর এক বেরিয়ে আসে—এসে নৌকা ঘিরে সারবন্দি সব জামাই-মেয়ে দেখতে দাঁড়িয়ে যায়! অনু চোখ বুজে প্রভাতের কোলের উপর মুখ ঢেকে পড়ল।

এরকম ভাবেই বা চলে কতক্ষণ! আস্তে আস্তে মাথাটা নামিয়ে আবার প্রভাত নেমে পড়ল। নৌকা অবিশ্রান্ত টেনে চলেছে, রাত্রির হিমের মধ্যে গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মাঝে মাঝে আর যেন পেরে ওঠে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। অনেকক্ষণ চুপ করে দেখে অনু আর পারল না, কাতর কণ্ঠে বলল—ওঠো—যা-হয় হোক। নৌকা থাক এখানে—

প্রভাত নাছোড়বান্দা। মাথা নেড়ে বলল—আর একটু—

অনু বলল—জোর না কি? তুমি উঠবে কি না বলো।

প্রভাতের হাত টানতে গিয়ে নিজেই নেমে পড়ল।

প্রভাত রাগ করে বলল—শরীর খারাপ, তার উপর জল বসানো ঠিক হচ্ছে কি?

—নৌকা-বাওয়া মাঝি, তুমি ডাক্তারির বোঝ কি?

বলেই অনু খিল-খিল করে হেসে উঠল। হাসি তার একটা রোগ, যত দুঃখ হোক, না হেসে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

প্রভাত বলল—জল বাড়ছে, তুমি ওঠো। এইবার খাল পেয়ে যাব বোধ হয়।

খালই বটে। অনেক কষ্টের পর ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। ভরা জোয়ারে কূল ছাপিয়ে বিলের অনেক দূর অবধি জল এসেছে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দু-জনে গা-হাত পা ধুয়ে নৌকায় উঠল। প্রভাত লগি ধরে খালের কূলে কূলে উজান বেয়ে চলল। তারপর নদীতে এসে পড়ল।

নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—রক্ষে পাওয়া গেল। যে ভয় তুমি দেখিয়েছিলে!

অনু বলল—উঃ, আমরা কত এগিয়ে এসে পড়েছি। এমন মানুষ তুমি গল্প করতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না।

প্রভাত বলল—আর গল্প করছি না, তুমি নজর রেখো। ফিরতি পথে চলেছি—বাড়ি ছেড়ে আবার এগিয়ে না পড়ি।

অনুপমা বলল—সে রকম অনাড়ি নই। এক বাঁক আগের থেকে বলে দেব, দেখো।

সেখানটায় নদী বড় সরু, দু-পারের গাছপালা ঝুঁকে পড়ে ভয়ানক

আঁধার করেছে। ক্লান্ত প্রভাত চুপচাপ বোঠে ধরে বসে আছে, স্রোতের টানে নৌকা আপনি চলেছে। ওপারের দিক থেকে হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে আওয়াজ এল, নৌকো নিয়ে গেল কোন্ সুমুন্দি গো? দেখতো কি জ্বালা!

আর একজন বলল, আজকাল বড্ড উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। একটা বিহিত হওয়া দরকার।

বিহিত আজই হবে। যাবে কোথায়? উড়ে যেতে পারবে নাতো। দেখতে পেলে দাঁড়ের ঘায়ে মাথা দু-ফাঁক করে দেব। এগিয়ে চলো দিকি—

পাড়ের কাছে জঙ্গল, প্রভাত লগির ধাক্কা দিয়ে প্রাণপণ বলে নৌকার মাথা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

অনু বলল, উ হু-হু কেয়াবন—আমার হাত ছড়ে গেছে।

প্রভাত বলল, কোন্ নৌকোর কথা বলছে, আমাদের এটা নয় তো?

কি জানি।

বিরক্ত কণ্ঠে প্রভাত বলল, বেশ লোক তুমি। এই যে বলছিলে, এ তোমাদের কোন্ প্রজার নৌকো।

আবার একটা ধাক্কা দিয়ে প্রভাত নৌকার আর খানিকটা কেয়ার ঝাড়ের নিচে ঢুকিয়ে দিল। অনু শিউরে উঠল, কেয়াবনে সাপ থাকে।

প্রভাত বলল, সাপের বিষের চিকিৎসা আছে, মাথা দু-ফাঁক হলে আর জোড়া দেওয়া যাবে না।…ঐ ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঝপ-ঝপ করে তিন-চারটা দাঁড় ফেলে খুব জোরে একখানা নৌকা আসছে—কাছে এসে পড়ল—একেবারে হাত দুই-তিনের মধ্যে। প্রভাত বলল, চুপ, চুপ।

ওদের নিশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বিপুল বেগে দাঁড় এসে লাগল এ নৌকার গায়ে—অনুপমা যেখানে বসে আছে, প্রায় সেই জায়গাটায়।

বাবা গো! অনু আর্তনাদ করে উঠল। এমন কাঁপছে, বুঝি বা জলেই পড়ে যায়।

কি? কি? কারা?

অপর নৌকা দাঁড় থামিয়েছে; হেরিকেন উঁচু করে দেখছে। আলোয় প্রথমটা চোখে ধাঁধা লাগে, তারপর দেখা গেল, যাক—মাথা দু ফাঁক করার মানুষ নয়, সতীশদাদা।

অনু বলল, সতীশ-দা, আমি—আমি—

ছইয়ের মধ্যে থেকে অনুর মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

খুকি নাকি? ঘাটে কি করিস? তিনি অবাক হয়ে গেছেন। বলতে লাগলেন, একলাটি পড়ে আছিস, বর ঘরে ঢুকতেই তাই তাড়াতাড়ি সতীশকে নিয়ে এলাম। তোরা বুঝি এখন রওনা হচ্ছিস? মাধব কোথায়? ও মাধব!

অনু বলল, মাধব-কাকা নেই।

সতীশ বলল, তবে কার সঙ্গে যাচ্ছ? নৌকো কোন্ মাঝির?

নৌকোর মাঝি বোঠে রেখে অগত্যা এসে দর্শন দিল।

বাবাজি?

সতীশের দিকে তাকিয়ে প্রভাত আমতা-আমতা করে বলতে

লাগল, কি করা যায়, বলুন। মাথাধরায় ছটফট করছিল। বলল
ভালো হাওয়ায় নৌকোয় গিয়ে বসব।

সতীশ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এখন আছে কেমন ?

সেরেছে। কি রকম কাদার প্রলেপ লাগিয়েছে দেখুন না। ও
বড্ড ভাল ওষুধ।

অনুপমার দামি শাড়িতে, চুলের উপর, কপালে, নোনাকাদায়
অপরূপ শ্রী খুলেছে। আঁধারে এতক্ষণ নজরে আসে নি। সেদিকে
তাকিয়ে মৃদু হেসে প্রভাত মুখ ফিরিয়ে নিল।

নন্দলাল গম্ভীরভাবে বোঝাতে লাগল, আমাকে ভয় না কর, না-ই করলে। নরকেব ভয় তো আছে। পতি পরম গুরু—শাস্ত্রে রয়েছে। যখন যা বলি—কথা-টথা শুনো, ভক্তিশ্রদ্ধা কোরো, বুঝলে?

মণিমালা পানেব বাটা নিতে এসেছিল, তাই নিয়ে চুপচাপ বেবিয়ে গেল। শাস্ত্রীয় বচন তাকে কতখানি বিচলিত করেছে, ঠিক ঠাহব কবা গেল না।

দবদালানে মেঝের উপর একরাশ বালিশ জড় করে পিসিমা বসে বসে অড পরাচ্ছিলেন। নন্দ সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। পিসিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এখন নয় বাবা, এখন অনেক কাজ। বিকেলের দিকে শুনব।

নন্দ বলল, কাজ কববে হাতে, কানে শুনতেও আপত্তি? বেশ, কোন কথা যদি আমি কাউকে কোনদিন বলি! অভিমানে তার গলা আটকে এল।

ওদিকে মতিলাল খড়ম পায়ে খট-খট করে এলেন।

ওরে সুখী, তোর গুলের কোটোটা দে তো একবার। দাঁত কন-কন করছে, ঐ দিয়ে দাঁত মেজে দেখি। তারপর ছেলের দিকে

নজর পড়ল! রুষ্ট হয়ে বললেন, নন্দ, তুই এখানে? তোকে বললাম না, নায়েব মশায়ের সঙ্গে সেহার যোগগুলো মিলিয়ে নিগে—

নন্দ তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে, জল তেষ্টা পেয়েছে। একগ্লাস জল খেয়ে যাচ্ছি।

যোগের নামেই জলতেষ্টা, তবে অঙ্কে অনার্স নিয়েছিস কোন সাহসে?

নন্দ ততক্ষণে ধুপ-ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেছে।

মতিলাল চৌকির উপরে বসে দাঁত মাজতে লাগলেন। সুখদা বললেন, যাই বল দাদা, তুমি বড় একচোখো, তোমার কোন বিচার নেই।

নন্দাটা লাগিয়ে গেল বুঝি!

সুখদা হাসিমুখে বলতে লাগলেন, তুমি ওর কথা কানেই নেও না, যখন তখন গালিগালাজ কর। তাও পরের বাড়ির ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে। হাজার হোক, ওর বয়স হয়েছে, বুদ্ধি জ্ঞান হয়েছে—

মতিলাল হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন।

হয়েছে না কি? কই, এত সব হয়েছে, আমি তো কিছুই জানি নে—

সুখদা বললেন—না দাদা, হাসি নয়, ও বড় দুঃখ করে বলছিল, আমি মা-মরা ছেলে, তা বলেও বাবার একটু দরদ নেই।

মতিলাল বললেন, আমার যে মা-বাপ দুই-ই মরা। আমার মাকে ও রাতদিন ক্ষেপাবে কেন? সুখী তুমি ওকে মানা করে দিও, ও আমার মা-কে না জ্বালায়। তা হলে আমিও কিছু বলব না।

মায়ের নাম করতে করতেই মা-টি ওদিকে স্বয়ং এসে হাজির। পনের-ষোল বছরের ফুটফুটে মেয়ে—পরনে নীলাম্বরি শাড়ি—চোখে-

মুখে চাঞ্চল্য উছলে পড়ছে। পানের বাটা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল।

বাবা, দেখুন—দেখুন কি কাণ্ড—

কি রে?

মণিমালা ঢাকা খুলে পানের বাটা মেঝের উপর রাখল। সে তখনও হাঁপাচ্ছে। বলতে লাগল, আমি পান সাজছিলাম—

সুখদা বললেন, সকালবেলা পান কি হবে রে?

কি হবে, বাসরে! মণি চোখ বড় বড় করে বলতে লাগল, বাবার খেয়ে উঠে লাগবে দুটো পান, আবার সন্ধ্যাবেলায় দুটো, আপনার লাগবে দুটো—ক-টা হল?

সুখদা হেসে ফেললেন।

তবু ভাল! আমি ভাবলাম, বুঝি বা তোর কোন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস—যজ্ঞির বাড়ি—সকালবেলা থেকেই পানের দরকার। সেই কোন দুপুরে লাগবে, এখন তাই সাজতে লেগে গেছিস?

মণিমালার নালিশ তখন পর্যন্ত বলা হয় নি! অধীরভাবে মাথা নেড়ে সে বলল, বাবা তাবপর শুনুন সে কথাটা—

মতিলাল বলিলেন, তুমি কাছে এসো।

কাছে এসে দাঁড়ালে সস্নেহে তিনি তার মুখের ক-গাছি উড়ন্ত চুল সরিয়ে বললেন, আগে আমার কথাটা শোন দিকি! তুমি কাজ করতে পাবে না, কাজের লোক আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। পদ্ম আছে, সৌদামিনী আছে, পানের বাটা তোমার ছোঁবার দরকারটা কি মা? তুমি শুধু ঘুর-ঘুর করে এ-বাড়ির উপর-নিচে আলো করে বেড়াবে—বুঝলে?

আচ্ছা। মণি তৎক্ষণাৎ রাজি। এসব বাজে প্রসঙ্গ এড়াতে

পারলে সে বাঁচে। হাত-মুখ নেড়ে সে বলতে লাগল, তারপর শুনুন না, যা বলছিলাম। আমি পান সাজছি—ও গিয়ে বলে, পান দাও। আমি বললাম, বাবার পান। তবু বলে, দাও। তারপর পান-সুপারি ছড়িয়ে ফেলল। আমি সব ঢেকে ফেললাম। চুণের ডিবে নিয়ে তাড়া করল। বলে, মুখে মাখিয়ে দেব—

সুখদা হাসতে লাগলেন। মতিলাল বললেন, ও ডাকাতকে নিয়ে তো আর পারি না। আচ্ছা, কি করা যায় বল্ মা? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই—কেমন?

মণিমালা চায় বটে যে অপরাধীর একটা কোন শাস্তি হোক। কিন্তু একেবারে নির্বাসন বোধকরি তার পছন্দ নয়। সে চুপ করে রইল।

মতিলাল বললেন, ভেবে-চিন্তে সে যা হোক একটা-কিছু করা যাবে। তুমি এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি ভাল কাপড় পরে গয়না-টয়না গায়ে দিয়ে একেবারে লক্ষ্মী-ঠাকরুণটি হয়ে এসো দিকি। আমি ততক্ষণে মুখটা ধুয়ে নি। পুরুত ঠাকুর মশায় নিচে বসে আছেন, তাঁকে প্রণাম করতে যেতে হবে।

বেরোবার সময়ই মণির সন্দেহ হয়েছিল,—কেউ যেন ছুটে চলে গেল, আড়ি পেতে সে সমস্ত কথা শুনে নিয়েছে। ঘরে গিয়ে সে পোষাকের আলমারি খুলছে, অমনি আলমারির পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল—সর্বনাশ—নন্দলালই যে! সেই চুণের ডিবে তার হাতে।

তোমার একগালে দেব চুণ, আর এক গালে কালি। বলে টেবিলের উপরে দোয়াতটা দেখিয়ে নন্দ গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল।

পালাবার জো নেই, একেবারে অতি-কাছে এসে পড়েছে। হাত

বাড়ালেই নন্দ তাকে ধরে ফেলবে। সভয়ে মণি বলল, না, ও কোরো না—ঠাকুর মশাই বসে যে—প্রণাম করতে যাচ্ছি।

নন্দ অবিচল। চুণের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বলে, দিই?

মণিমালা মিনতি করতে লাগল, বাবা শিগগির যেতে বলে দিয়েছেন—তিনি রাগ করবেন।

তিনি তো রাগ করেই আছেন। এতক্ষণ ধরে আমার এত গুণগান কবে এলে।

আমি? মণিমালা যেন আকাশ থেকে পড়েছে।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—নিজের কানদুটোকে অবিশ্বাস কবি কি করে?… আমি এবার কি ঠিক করছি জান?

কি?

দেশান্তরি হয়ে যাব। হ্যাঁ—চিরদিনের জন্য চলে যাব। এই জামাটা গায়ে দিযে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

এক মুহূর্তে মণিমালার চোখ ছল-ছল করে উঠল।

আমি তাই বলেছি নাকি?

না, তা ঠিক বল নি। সকলেব চক্ষুঃশূল হয়ে আছি, আমি গেলেই তো তোমাদের ভাল।

মণি বলল, তুমি আমার সঙ্গে অমন কর কেন?

কি করি? যা একটু-আধটু করি, তার তো এক-শ গুণ করে লাগিয়ে আমায় গালি খাওয়াও। তোমার কাছে একটা পান চেয়েছিলাম —না হয় একটু কাড়াকাড়ি করেছি—কিন্তু পানের বাটা ছড়িয়ে ফেললাম কখন? কেন মিথ্যে কথা বললে?

মণিমালা একেবারে ভেঙে পড়ল।

বলতাম না, কক্ষনো বলতাম না—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর বলব না।

আর নালিশ করবে না? কখনো না? কোন দিন না?

না। আঁচলে চোখ মুছে মণি বললে, তুমি তা হলে দেশান্তরি হবে না তো?

নন্দ এক মুহূর্ত ভেবে বলল—আচ্ছা, এবারেব মতো না হয় থেকেই গেলাম। মুখ টিপে হেসে সে মণির বাটা থেকে টপাটপ তিন-চারটে পান মুখে ফেলে দিল। মণিমালা লক্ষ্যই করল না, সে আর একদিকে চেয়ে আছে। তারপর সজল চোখে সে গহনাব বাক্স খুলে বসল।

মতিলাল এসে হাঁক দিলেন, কই রে!

নন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। মতিলাল তার দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে বললেন, আমি ভাবছি শ্রীমান এতক্ষণ সাতচল্লিশ সনেব সেহা শেষ করে আটচল্লিশ সন ধরেছেন। তুই যে কাজের নামে কেবল পাশ কাটিয়ে বেড়াস—দেখ, অকর্মা লোক আমি মোটে দু-চক্ষে দেখতে পারি নে।

নন্দ ঘেমে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বলল—আজ্ঞে চটিটা খুঁজে পাচ্ছি না।

মতিলাল্ একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন।

দেড় টাকার চটিজোড়া হারিয়ে ফেললি? নতুন জুতো—এখনও দু-হপ্তা হয় নি। এরকম ছন্নছাড়া স্বভাব—তুই বেটা আমাকে ফতুর করে ছাড়বি।

মণির স্বভাব-দোষ—টিপ্পনি না কেটে থাকতে পারে না। বলল, কি রকম সুন্দর জুতো বাবা, কেমন নরম! এখন বাড়িসুদ্ধ সবাই খুঁজে বেড়াও—

মতিলাল রাগ করে বললেন, তুমি কখনো খুঁজতে যাবে না মা। বয়ে গেছে। আমার মা কি কারো দাসী-বাঁদী যে জুতো হারালে জুতো খুঁজে দিতে হবে, ঘুম না হলে বাতাস করতে হবে? নবাব সিরাজদ্দৌলার উদয় হয়েছে আর কি!

নন্দর সঙ্গে মণিমালার চোখোচোখি হয়ে গেল। নন্দ গম্ভীরভাবে গেঞ্জি পরছে। ভয় হল, একটু আগে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা মণির মনে পড়ে গেল। মণি বলে উঠল, বাবা জুতো খুঁজতে আমায় বলে নি তো। এই এখানে কোথায় আছে,—এক্ষুনি পাওয়া যাবে।

মতিলাল বললেন, না পেলে খালি-পায়ে বেড়াতে হবে, সে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। আমার অত সস্তা পয়সা নেই। তারপর হঠাৎ কণ্ঠ অতি মোলায়েম করে মণিকে বললেন, সে যাকগে।—মা-লক্ষ্মী, তোমার হল কি? এখনও তৈরি হতে পারলে না?

এই যে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মণিমালা গহনাগুলো পরতে লাগল। গহনার বাক্সর মধ্যে দুল নেই—হীরে-বসানো দুল—মণিমালার মুখ শুকিয়ে গেল, পাতি-পাতি করে খুঁজতে লাগল, গহনার বাক্স উলটে ফেলে দিল। কোথাও নেই।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করলেন কি?

কাঁদ-কাঁদ হয়ে মণি বলল, বাবা, দুল পাচ্ছি না।

দামি দুলজোড়া—মতিলাল মনে মনে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু বাইরে সে-ভাব দেখাবার জো নেই, ছেলেমানুষ মণি তা হলে একেবারে কেঁদে ফেলবে। তিনিও খোঁজাখুঁজি করে শেষে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আছে কোথাও, পরে দেখলে হবে। ভারি তো দাম—এক-শ দেড়-শ টাকা—তা যাকগে, তুমি মুখ আঁধার কোরো না মা, ওর চেয়ে ভাল জিনিষ গড়িয়ে দেব।

তারপর চিন্তিত স্বরে বললেন, এখনই বা কি পরে যাও? দেখি…
সুখী, ও সুখী!

ডাক শুনে সুখদা এসে ঢুকতে মতিলাল বললেন, কানের দুল আছে?

সুখদা বললেন, বাড়িতে দুলের দোকান কি না! কেন, কি হবে?

মতিলাল বিমর্ষভাবে বললেন, দেখ তো মুশকিল! বউমা ঠাকুর মশাইকে প্রণাম করতে যাবে, কি পরে যায়?

সুখদা বললেন, একজোড়া দুল তো ঐ কানে রয়েছে, কতগুলো লাগবে?

মতিলাল তাকিয়ে দেখলেন, মণিমালাও হাত দিয়ে দেখল—তাই তো দুল কানেই রয়েছে। কাল রাত্রে সব গয়না খুলে রাখবার সময় দুল আর খোলা হয় নি, সেটা কানেই রয়ে গেছে। মতিলাল হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণিমালার অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, দুল কানে রয়েছে, অথচ তুই দেখিস নি—আমিও না। যেমন হাবা মা, তেমন হাবা ছেলে!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন, বুঝেছি—আর এক জোড়া নতুন দুল পরবার সাধ হয়েছে। ফাঁকি দিয়ে তাই আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলি। বেশ, বেশ—তাই হবে, মতি মিত্তির এক কথার লোক—দেশ-সুদ্ধ সবাই জানে। কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, কালই সেকরা ডাকব। কিন্তু মা, ও শাড়িতে হবে না তো, ওতে মানাচ্ছে না। লাল বেনারসিটা চট করে পরে এসো, আমি ততক্ষণ প্রণামির টাকা বের করে আনি। বুঝলে?

যাবার মুখে নন্দকে আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, এখনও জুতো খুঁজে বেড়াচ্ছ? সাদর বাড়ি অবধি খালি পায়ে গেলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? একেবারে যে নবাব হয়ে উঠছ দিন দিন। যাও—দেরি কোরো না।

বাবা বেরিয়ে যেতে নন্দ বোমার মতো ফেটে পড়ল।

দেখলে পিসিমা, বাবার বিচারটা দেখলে?

হাসি চেপে সুখদা বললেন, কি?

চটি আমার হারায় নি, মিছে কথা। নিচে রয়েছে। আর সত্যি সত্যি যদি হারাত, দেড় টাকা দামের জন্য বাবা একেধারে কতুর হয়ে যেতেন—আর ওদিকে চুল থাকতেও দেড়-শ টাকার চুলের হুকুম হয়ে যায়। অত বড় ডাগর পরের বাড়ির মেয়ে—তার সামনে যখন তখন আমাকে যাচ্ছে-তাই করে বলা…টিপি-টিপি হাসতে হাসতে চলে গেল, আমি স্পষ্ট দেখেছি। এর একটা বিহিত না হলে পিসিমা আমি ঠিক দেশান্তরি হয়ে যাব—

দুপুরে মণিমালা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। নন্দ ভাবল, এই সময়—সে পা টিপে টিপে এসে আঁচল থেকে চাবি খুলে নিল, চাবি দিয়ে পোষাকের আলমারি খুলল। কাপড়ের বাণ্ডিল—পায়ের চটি-জোড়া খুলে সন্তর্পণে তার মধ্যে জড়িয়ে রাখল। তারপর আবার সব বন্ধ করে আঁচলের চাবি আঁচলে বেঁধে ভালমানুষটির মতো ডাকল, মণি!

মণিমালার সাড়া নেই। অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে, কিছুই সে টের পায় নি। দুষ্ট হাসিতে নন্দর মুখ ভরে গেল। তাড়াতাড়ি সুখদার কাছে হানা দিল।

পিসিমা দেখ এসে কাণ্ড—দেরি করলে হবে না…এক্ষুনি—

টানাটানি করে সুখদাকে নিয়ে এল। তারপর যেন ডাকাত পড়েছে, এমনি চিৎকার।

সুখদার করুণা হল, বললেন, আহা, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে—কেন অমন করে জ্বালাতন করিস বল্ ত?

নন্দ বলল, কেন করি? এখনই দেখবে পিসিমা। তখন চটি নিয়ে বাবা কত কি বললেন—সে জুতো কোথায় জান? একজন বলে দিয়েছে, তার নাম করব না। সে জুতো চুরি করে রেখেছেন ঐ শান্ত ভাল-মানুষটি।

...ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিল।

মণিমালার ঘুম ভেঙেছিল, বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো সে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল।

আমি চোর?

নন্দ মুখ টিপে হেসে বলল, চোর বললে তো মান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। না পিসিমা? জুতো-চোর! জুতো চুরি করে আলমারির মধ্যে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

না—কক্ষনো না। মিথ্যে কথা।

রাগে গব-গব করতে করতে মণি ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিল।

দেখ—

নন্দ চাবি হাতে করে নিয়ে আবাব তার হাতে দিল। বলে, না, ও-ই খুলুক। বাড়িসুদ্ধ সকলেব কাছে আমি খারাপ। শেষে হয়তো বলবে, খুলবার সময় কেমন কবে ঢুকিয়ে বেখেছে।

দ্বিরুক্তি না কবে মণি আলমারি খুলে ফেলল। কাপড-চোপড মেঝেব উপব ঝুপ-ঝুপ কবে ফেলতে লাগল। বলে, দেখ, দেখ—

সেই সঙ্গে চটিও পডল।

নন্দ কলরব কবে উঠল, দেখ পিসিমা, তোমাদের বউয়ের কেমন হাত-সাফাই দেখলে তো?

মণির চোখে তখন জল এসেছে। পিসিমা বলেন, হাতসাফাই বউয়ের কি কাব, জানিনে বাপু। কিন্তু আমাব এখন ঢের কাজ, বসে তোদেব লডাই দেখলে চলবে না।

হাসিমুখে সুখদা বেবিয়ে গেলেন।

পিছন থেকে নন্দ বলতে লাগল, পিসিমা, জুতো চোরের শাস্তি কি হয়, বলে গেলে না?

মণিমালা সজল চোখে বলল, আমি কিছু জানি নে। সত্যি বলছি। কেউ ওর মধ্যে রেখে দিয়েছে।

নন্দ বলল, কিন্তু চাবি তোমার কাছে। ও তালা তো যে-সে চাবিতে খোলে না।

এ কথাব জবাব নেই। মণিমালা চুপ কবে রইল।

নন্দ তখন গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, যেই রাখুক, ভগবানের

শাস্তি। পতি পরম গুরু—মান না যে তুমি! বাবার কাছে মিছে কথা লাগিয়ে গালি খাওয়াও, তিনি এখন সব কীর্তি জানুন।

সভয়ে মণি বলল, তুমি বাবাকে এ সব বলতে যাবে নাকি?

বলতে হবে বই কি! বাবাকে বলব। পিসিমা তো দেখেই গেছেন, তিনি সাক্ষি। তারপর পদ্ম-সৌদামিনী ওরা সব রয়েছে, কাছারির নায়েব-খাজাঞ্চিবাবু প্রজা-পাইক যারা সব আসছে—

তা হলে গ্রামশুদ্ধ ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে, বল।

নন্দ বলল, গালি দেবার বেলা বাবার গলা যে গ্রাম ছাড়িয়ে যায়।

মণি রেগে বলল, বেশ, বেশ! তাই করগে যাও—এক্ষুনি যাও।

কিন্তু নন্দর তাড়া নেই, মণিমালার বিছানাব উপর বেশ জেঁকে বসল। বলল, এক্ষুনি তো হয়ে উঠবে না। বাবা ঘুমুচ্ছেন, নায়েবরা কেউ আসেন নি, সৌদামিনী বাসন মাজছে সবাই জমায়েত হোন, চুরির কেস—সহজ তো নয়—

মণি বলল—আমার বিছানা ছাড,—ছাড বলছি। আমি শোব, তুমি যেখানে ছিলে যাও। তারপব যখন কেস হয—হবে।

সর্বনাশ—আসামিকে ছেড়ে যাওয়া যায় নাকি?

বলতে বলতে নন্দ বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল। বলল, চুরি তো চুরি—একেবারে জুতো-চুবি। যে সে ব্যাপাব! কোর্টে গেলে নিদেন পক্ষে ছ-টি মাস—

তবে আমি যাচ্ছি।

বলে মণিমালা একছুটে বেরিয়ে গেল।

বালিশে মুখ গুঁজে নন্দ খুব খানিকটা হেসে নিল। এই ব্যাপারে —মিথ্যুক মেয়ে—দুষ্টু মেয়ে—তোমাকে আজ ভাল করে দেখে

নেব।···হঠাৎ হুড়-মুড় করে বারাণ্ডার দিক থেকে কি নিচে পড়ল। লাফিয়ে ছুটে নন্দ বেরিয়ে এল।

মণিমালা নেই—বারাণ্ডার ঠিক নিচে লিচু-বাগান—ঘন-সন্নিবিষ্ট ডালে পাতায় তলার কিছু দেখবার জো নেই। নন্দ তাকিয়ে দেখল, ডালের মাথায় আটকে রয়েছে, ছেঁড়া লেপ-তোষক। ঐ সব স্তূপাকারে অনেক দিন থেকে রেলিঙের ধারে রাখা ছিল। ওগুলো পড়েছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে কি···সে কথা ভাবতে নন্দ পাগল হয়ে ওঠে। আহা ছেলে মানুষ—তাকে অমন করে ক্ষেপানো—যদি সত্যিই অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকে?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে অনেকটা ঘুরে বাগানে যেতে হয়। চোখের জল মুছতে মুছতে নন্দ ছুটল।···লিচু-বাগানে কোন অচেতন দেহ নেই, রান্নাঘরে নেই, কাঁচামিঠে আমতলায় নেই, পুকুরঘাটেও নেই। জ্যৈষ্ঠের খর দুপুর। সূর্য্য আগুন ছড়াচ্ছে। নন্দ অনেকক্ষণ ঘুরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে রুদ্ধশ্বাসে আবার উপরে ফিরে এল।

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

ব্যাকুল কণ্ঠে নন্দ ডাকল, মণি—মণি!

শান্ত নিরুদ্বেগ উত্তর এল, আমি ঘুমুচ্ছি।

বেশ করছ, আমায় কৃতার্থ করেছ। আমি রোদের মধ্যে এ-দেশ-সে-দেশ ছুটোছুটি করে মরছি।

হাসির চোটে মণি কথাই বলতে পারে না। বলল, তোমায় দেখে আমি চিলের ঘরে ঢুকে পড়লাম, তুমি দেখতে পেলে না, হি-হি-হি—

পূবের কামরার দরজা খুলে মতিলাল বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে দেখে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

সেহার যোগ হয়ে গেছে ?

নন্দ বলল, এখন নায়েবরা নেই।

নায়েব না থাক, খাতা তো রয়েছে। যোগ দিতে আটকায় কিসে ? যাও।

নন্দ বলল, যাচ্ছি বাবা। চটিটা নিয়ে যাব।

—চটি ? খুঁজে পেয়েছ তা হলে ? দিনের মধ্যে বিশ বার হারাবে—এমন আহাম্মক তুমি !

নন্দ বলল, আজ্ঞে, আমাব দোষ নেই। ও-ই চুরি করে সেরে বেখেছিল। পিসিমা জানেন। আলমারির মধ্যে রেখে মিছামিছি আপনাকে দিয়ে বকুনি খাওয়ালে।

মতিলাল ডাকতে লাগলেন, বউমা, বউমা, ওর চটিজোড়া আছে নাকি ?

মণিমালা জবাব দিল—ঘুমুচ্ছি, বাবা।

তবে আর উঠো না, ঘুমোও। তরমুজের সববৎ রয়েছে আমার ঘরে। ঘুম হয়ে গেলে খেয়ে এসো।

তারপর নন্দর দিকে চেয়ে মতিলাল রেগে উঠলেন।

এখনো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে ? খালি-পায়ে এইটুকু গেলে ফোস্কা পড়ে বুঝি ! দিন দিন কি নবাবই হয়ে উঠছ !

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর, ধুলো আগুন হয়ে উঠেছে, পায়ে সত্যিই ফোস্কা পড়ে। কিন্তু পায়ের অদৃষ্টে যা-ই থাক, বাবার সামনে এ রকম আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

মণিমালা নিবিকার ঘুমুতে লাগল। নিশ্বাস ফেলে নন্দ সদরবাড়ি চলল।

তারাশঙ্কব চক্রবর্তীব চোখের অসুখ। উপসর্গ অতি উৎকট। রাত্রে আলোর দিকে চাইলে চারিদিকে গোলাকার আংটির মতো দেখেন, আবাব আলো নেভালে অন্ধকারে কিছুই দেখেন না। লক্ষণ শুনে গোপীকান্ত উদ্বিগ্ন হযে উঠলেন। বলেন, না—না ভাই, চক্ষুরত্ন মহাধন। অবহেলা করাটা কিছু নয়। নিরুকে লিখে দিচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে এসে পড়বে।

বন্ধুর আগ্রহে তারাশঙ্কর মনে মনে খুশি। মুখে তবু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ভারি তো ইয়ে···এমনই সেরে যাবে। বাবাজির নতুন প্রাকটিশ, মোকাম ছেড়ে এ সময়ে আসা ঠিক নয়।

গোপীকান্ত আরও জেদ ধরেন।

হোক প্রাকটিশ। আপনার লোকের অসুখে-বিসুখে না-ই যদি কাজে লাগবে, বামুনের ছেলে হয়ে তবে এ মড়াকাটা বিদ্যে শেখা কেন? তোমার পরে ভক্তি কত! চিঠি পেলে একেবারে পাগল হয়ে ছুটে আসবে।

এ বাড়ি গোপীকান্ত এলে জলখাবারের থালা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। ঝি-চাকর অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চেয়ারে উবু হয়ে বসে গোপীকান্ত নিঃশব্দে থালাটা শেষ করলেন। এক ঢোক জল খেয়ে তারপর দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, প্রাকটিশ আর মোকাম—ছাই আর ভস্ম। তোমাকে জানি আজকের থেকে নয়। অমন দয়ামায়ার শরীর কলিযুগে হয় না। শুভকর্মের পর তুমি কি জামাইকে অত দূরে নোনা রাজ্যে থাকতে দেবে, না আমার মা-লক্ষ্মীটি তাই হতে দেবেন? সেই আসতে হবে, দু-দিন আগে এসে একটু কাজে লাগুক না—

চোখের জন্য তারাশঙ্করও সম্প্রতি বড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কথাবার্তা অনেকদিন ধরে চলছে, গোপীকান্ত ধৈর্য্য ধরে আছেন, কিন্তু আর দেবি করা চলে না। বুড়ার বড ইচ্ছা, কোন একটা মন্ত্রবলে দু-দশ দিনে চোখ একেবারে নির্দোষ হয়ে সেরে যায়! তাহা হলে আব বাধা থাকে না—দু-চোখ ভরে তিনি তাঁব মা-হাবা মেযের আনন্দের ছবি দেখতে পারেন।

ছেলেকে গোপীকান্ত কি লিখে দিলেন, কে জানে—দিন তিন-চারেব মধ্যে নিরঞ্জন এসে হাজির। এবং শুধু সে নয়, সঙ্গে তিনখানা গরুর গাড়ি—তাতে আলমারি, চেয়ার ও প্যাকিং-বক্সে বোঝাই ভাঙা শিশি বোতল। অর্থাৎ ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ডিসপেনসাবিও নোনা রাজ্য আঁধার করে চলে এসেছে।

গোপীকান্ত বললেন, কোথায় তুলবে এ সব? একেবারে তারাদাদার বৈঠকখানায়? দু-দিন পরে ওখানেই যখন বসতে হবে।

নিরঞ্জনের কিন্তু মহা আপত্তি। বলল, ক-দিনের জন্য আর কেন বাবা? লোকে নানা কথা বলাবলি করবে। উনিই বা কি মনে করবেন?

খানিক তর্ক করে গোপীকান্ত অবশেষে ক্লান্ত হলেন। মুটেরা দাঁড়িয়ে আছে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ওরে হাবা বেটারা, গলির ঐ শেষ বাড়িতে। সামাল হয়ে নামাস।

তারপর আপন মনে বকতে লাগলেন, আবার আর এক দফা মুটে-ভাড়া লাগবে—গণ্ডা আষ্টেক পয়সা ইচ্ছে করে গচ্চা দেওয়া। গলির মধ্যে তো আর ডিসপেনসারি চলবে না। আর দরকারটাই বা কি—সদরের উপর যখন অমন তোফা বৈঠকখানা রয়েছে। একবারে হলে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হত না।

ঘণ্টাখানেক পরে নিরঞ্জন তারাশঙ্করের বাড়ি দর্শন দিল। মাধুরী তখন স্নান করে এসেছে, নিচের তলায় মাঝের ঘরে ভিজা চুল এলিয়ে খস-খস করে কাকে চিঠি লিখছে। উঁকি দিয়ে দেখে নিরঞ্জন ভিতরে এল। বলল, অসুখ শুনে ব্যস্ত হয়ে চলে এলাম।

মুখ তুলে মাধুরী নমস্কার করল। নিরঞ্জন চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছে দেখে বলল, আমার অসুখ নয়, বাবার। তিনি ঐ ঘরে। মৃদু হেসে আপন মনে সে আবার লিখতে লাগল।

পরদিন দুপুরবেলা মাধুরী বাপকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে, তারাশঙ্কর চোখ বুঁজে আছেন। মাঝে মাঝে মাধুরী সাড়া নেয়—ও

বাবা, শুনছ? তারাশঙ্কর বলেন—হুঁ। শেষে তাকিয়ে তাকিয়ে মাধুরী হাসিমুখে চুপ করে রইল। খানিক পরে তারাশঙ্কর পাশ ফিরে অভ্যাস মতো জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

মাধুরী বলল, তারপরে নেই—

নেই কি বলিস! অতবড় কাগজ—এর মধ্যে ফুরিয়ে যাবে? চোখ মেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, ঘুমুই নি আমি, সত্যি ঘুমুই নি—এই দেখ্। দুপুরবেলা রোদের সময়টা বাবাজি চোখ বুঁজে থাকতে বলেছেন—নইলে চোখে যাতনা হয়—

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, আর নাক ডাকাতেও বলেছেন নাকি?

নাক ডাকে সাধে? আমার যে আজ ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

মাধুরী নিরীহভাবে বলল, চোখ কর-কর করছে বুঝি!

তাবাশঙ্কর রাগ করে উঠলেন, কি বোকা মেয়ে তুই, তোর মাথায় এক ছটাক বুদ্ধি নেই। লোকে বুঝি কেবল চোখের ব্যথায় কাঁদে—মনের আনন্দে কাঁদে না!

হঠাৎ সুর মধুর মোলায়েম করে বললেন, আচ্ছা, তোর মায়ের কথা মনে পড়ে?

এক ক্ষান্ত-বর্ষণ ভাদ্রের সন্ধ্যা। মা চোখ বুজলেন। দু-পায়ে আলতা, সিঁথিভরা সিঁদুর, পরণে টকটকে লাল শাড়ি, গায়ের রং সোনার মতো ঝক-ঝক করছে, ফুলে ফুলে শান্ত মুখখানা আর দেখবার জো নেই। সে কথা মনে পড়লেই মাধুরীর চোখ জলে ভরে আসে। মাধুরী ঘাড় নাড়ল।

তিনি থাকলে আজ কি করতেন, বল্ তো।

ম্লান হেসে মাধুরী বলল, তোমার চোখে হাত বুলিয়ে দিতেন, বাতাস করতেন, চন্দন লাগিয়ে দিতেন, কত যত্ন করতেন! তোমার এত কষ্ট হত না বাবা।

ছাই করতেন। তারাশঙ্করেরও মুখ করুণ হয়ে উঠেছে, সে ভাব কাটিয়ে তিনি প্রবল বেগে হাসতে আরম্ভ করলেন। বললেন, তিনি থাকলে এতক্ষণ পিড়ি-চিত্তির করতে বসে যেতেন। বড্ড ভাল আলপনা দিতে পারতেন কিনা—পদ্ম আঁকতেন, ফুল লতাপাতা আঁকতেন, জামাই এসে তার উপর বসবে।

বাইরে থেকে নিরঞ্জন বলল, আসতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এসো বাবা। ওরে মাধুরী, বসতে দে বাবাজিকে। আগ্রহে তারাশঙ্কর বিছানায় উঠে বসলেন। বললেন—তোমাদের কথাই হচ্ছিল বাবাজি, মাধুরীর ত মা নেই জানো—

কি জানি কি বলে বসেন, বাবাকে বিশ্বাস নেই, মাধুরী কথার মাঝখানে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—মা নেই, ওঁর তাই কত কষ্ট হয়, চোখের যন্ত্রণা—

তারাশঙ্করও হেসে মেয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন—বুড়ো মানুষ, আজ চোখেব অসুখ, কাল কানের, পরশু বুকের—সব সময়ে একটা না একটা ব্যাধি লেগেই আছে। তাই ভাবছি, ডাক্তারটিকে হাতছাড়া করা হবে না, একেবারে বাবা বলে বাড়িতে কায়েম করে বসাই। ভিজিট লাগবে না, সর্বরকমে স্থবিধে। কি বলিস রে মাধু-মা?

বলে মেয়ের দিকে চেয়ে তারাশঙ্কর নিজের রসিকতায় হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মাধুরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে তর্জনের ভঙ্গিতে বলল—কোন কথা নয়, তুমি এবারে চোখ বুঁজে ঠাণ্ডা হয়ে শোও।

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন—না, কেন চোখ বুজব? তোর শাসনের জ্বালায় আমি যাই কোথায়! বাবা কবে মরে গেছেন, মনে পড়ে না। আমার নতুন বাবাকে একটু তাকিয়ে দেখব, তা তুঁই অমন করিস কেন?

—বেশ, যা ইচ্ছে কর—আমি যাই।

মেয়ে সত্যিই উঠতে যায় দেখে তারাশঙ্কর শঙ্কিত হলেন। বিনা তর্কে টিপ করে শান্ত ছেলের মতো শুয়ে পড়লেন, আর নড়াচড়া নেই।

এতক্ষণে ডাক্তারেরও সমর্থন এল।—হ্যাঁ, এই ঠিক। পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিন। বাইরে কি রকম রোদের হল্কা বয়ে যাচ্ছে!...মাধুরী দেবী, আসুন আমরা ও-ঘরে যাই—

মাধুরী ঘাড় নাড়ল।—আমি যাব কি করে? আমি যে বাবাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছি।

—ওঁর বিশ্রামের দরকার। উনি ঘুমোন।

মাধুরী বলল—চোখের অসুখ ডাক্তারবাবু, কানের ত নয়। কানে শুনলে কি ক্ষতি হবে?

তারাশঙ্কর রাগ করে বললেন—ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করিসনে। আমি কাগজ শুনব না, তুই যা।

—বেশ, তাই...আর কক্ষনো যদি—অভিমানে মাধুরীর স্বর ভারি হয়ে এল। বলল—আজকাল তুমি আমাকে তাড়াতে পারলে বেঁচে যাও, বাবা—সর্বক্ষণ সেই চেষ্টায় রয়েছ। তা বেশ—

আর, বিশ্রাম। তারাশঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে মেয়ের চোখ মুছে দিলেন। বললেন—শুনছি গো শুনছি। নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে

—আমি যে বাবাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছি।

বলতে লাগলেন—ওর মা যেদিন স্বর্গে গেলেন, সেইদিন থেকে ও আমার খবরদারি করছে। এমন কড়া গার্জেন তুমি দেখ নি বাবাজি। বিনা হুকুমে আমাকে পাশ ফিরতে দেবে না। রোজ দুপুরে খবরেব কাগজ পড়ে শোনায় কিনা, সে কিছুতে রদ হবার জো

নেই। নিরঞ্জন, তুমি বাবা বিকালবেলা এসো, এখানে এসে চা খাবে।

নিরঞ্জন চলে গেল, তারাশঙ্করও যথারীতি চোখ বুজেছেন, কিন্তু কাগজ পড়া আর এগোয় না। পড়তে গিয়ে মাধুরীর গলা আটকে আসে। তারাশঙ্করের চমক লাগল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে শয্যার উপর উঠে বসলেন। বললেন—কি হয়েছে?

—কিছু না।

তারাশঙ্কর দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—হয়েছে, একশবার হয়েছে। চোখের অসুখ হলে কি হয়, সমস্ত দেখতে পাই। হ্যাঁ মা, তোর চোখ লাল কেন রে?

—লাল না হাতী। তুমি শোও। বলতে বলতে বাপের স্নেহস্বরে মাধুরীর চোখ ভরে জল এল, জলের ধারা টপ-টপ করে ঝরতে লাগল।

—ওরে বাস রে, একটু অবাধ্য হতে গিয়েছি, এখনো রাগ মিটছে না। মা কি এইরকম হয় রে, এ যে একেবারে দুর্বাসা ঠাকরুণ!

মাধুরী বলল—রাগ নয় বাবা, চোখে এমনি জল এল।

—শুধু শুধু? সে ত আরও খারাপ কথা। তারাশঙ্কর ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বললেন—চোখের অসুখ বড্ড ছোঁয়াচে। তোর আবার একটা কিছু হল না ত? চোখ লাল, কথায় কথায় জল পড়ে··· ডাক্তারকে বলতে হবে।

মাধুরী বলল—আমার কিছু হয়নি বাবা, তোমারই জন্যে—

—আমার? আমারই বা এমন কি হয়েছে?

—তুমি যে দেখতে পাও না!

—কে বল্লে? কে তোকে মিথ্যে কথা বলে কাঁদাচ্ছে? মেয়ের মন থেকে দুর্ভাবনা নিঃশেষে মুছে দেবার জন্য তারাশঙ্কর খুব হাসতে লাগলেন। বললেন—দেখতে পাই নে আবার। এতবড় সংসার সমস্ত নখদর্পণে রয়েছে, বল্ দিকি কোনটা দেখছি না। তা আর বলতে হয় না।

—তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, চোখ কর-কর করে।

ঘাড় নেড়ে তারাশঙ্কর বললেন—করে না।

মাধুরী তাড়া দিয়ে উঠল—করে, তুমি বুঝতে পার না। এ ডাক্তারে চলবে না, আমি বলে দিলাম।

তারাশঙ্কর অতঃপর আর প্রতিবাদের ভরসা পেলেন না। মৃদু কণ্ঠে বললেন—কি জানি, করে হয় ত। কিন্তু ও ত একটা দিন মোটে দেখেছে। আরও কয়েকটা দিন না দেখলে—

মাধুরী দৃঢ়কণ্ঠে বলল—একদিনও নয়। আমি অন্য ডাক্তার নিয়ে আসছি।

—কাকে? জ্ঞান বাবু—চৌরাস্তায় যাঁর বাড়ি? সে ডাক্তার কি ভাল হবে?

মাধুরী বলল—না বাবা, কলকাতায় খবর দিয়েছি। নিখিল বাবু আসছেন। বাবা, নিখিল-দাদার কথা তোমার মনে নেই?

তারাশঙ্কর একটু ভেবে বললেন—হিরণের ছেলে?

মাধুরী হেসে বলল—এখন তিনি মস্ত বড় ডাক্তার। বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছেন। ক-দিন মোটে এসেছেন—কাগজে কত কি লিখেছে, তা যদি শোন তুমি বাবা।

—তুই এত কথা পড়ে শোনাস, তার কথা ত কই এক বর্ণ

পড়িস নি। তোর যদি একেবারে কোন বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে! বলতে বলতে হঠাৎ তারাশঙ্কর হেসে উঠলেন। বললেন—খবরের কাগজে অনেক কথা লিখেছে বুঝি? ও ঠিক ঘুস খাইয়েছে। নিখিল আবার ডাক্তার হবে! এমন ছটফটে ছেলে···আমি বারবার বলে এসেছি, তোর কিচ্ছু হবে না। একদিন ধরে বেঁধে পাকা চুল তুলতে বসালাম ত কাঁচায় পাকায় তিন মিনিটে তিন গোছা নির্মূল করে পিঠটান। এক একটা পাশ করত, বৃত্তি পেত, খবর দিয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে চট করে পালাত—আশীর্বাদ নেবার সবুর সইত না। আমি বলতাম, এত চঞ্চল তুই—পাশ করলে কি হয়, তোর কিচ্ছু হবে না।

অনেক কাল আগেকার অনেক স্মৃতি বুড়ার মনে এল, চোখে-মুখে স্নেহ উছলে পড়তে লাগল। বলতে লাগলেন—দেশে ফিরেছে, একবার এল না, একটা খবরও দিল না। ভেবেছে, জেঠা-বুড়ো এতদিনে মরেছে, আপদ গেছে।

মাধুরী বলল—ফিরেছেন ত দিন কুড়িক মোটে।

—কুড়ি দিন? তা হলে এদ্দিনে বিশ-কুড়িটা রোগি সাবাড় করে ফেলেছে। যা চটপটে! ও আবার মাথা ঠাণ্ডা করে ওষুধ দেবে! তারপর আগ্রহের সুরে মেয়েকে আবার প্রশ্ন করলেন—আসতে লিখেছিস ত ঠিক? বুড়ো বয়সে চোখ দুটো যদি যায়, আপনার লোকের হাতেই যাক। বাজে লোকের হাতে গেলে ক্ষোভের পার থাকবে না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারাশঙ্কর আবার বলে উঠলেন—লিখেছিস ত রে? সন্দেহ থাকে ত না হয় আর একবার লিখে দে। চোখের অদৃষ্টে যা-ই থাক, বেটা সাত সমুদ্দুর পার থেকে এল, চোখ থাকতে থাকতে একটা বার দেখে নিই—

মাধুরী বললে—চিঠি লিখি নি বাবা, টেলিগ্রাম করে দিইছি। হয়ত সন্ধ্যে নাগাত উদয় হবেন। বিলাতের ডাক্তার, চিকিৎসা করবেন ভাল—কিন্তু ঝগড়ার চোটে বাড়িতে মানুষ টিকতে পারবে না, এই দুঃখ।

হলও তাই। সন্ধ্যার পর উঠানে তুমুল কলরব! তারাশঙ্কর চমকে উঠলেন।

—দেখ ত দেখ ত রে, ঠাকুরের সঙ্গে বুড়ি ঝির আবার বুঝি লড়াই বাধল!

মাধুরী কিন্তু ঠিক বুঝেছে। ঝগড়া করতে পারে বুড়ি ঝি, কিন্তু এমন আকাশভেদী গলা কোথায় পাবে? নিখিলচন্দ্র বাড়ি পৌঁছে প্রথম মোহড়ায় নিচের লোকজনের সঙ্গে সাদর-সম্ভাষণাদি শুরু করেছে। ধুপ-ধাপ শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে সে এসে তারাশঙ্করকে প্রণাম করল।

তারাশঙ্কর হাঁ হাঁ করে উঠলেন—করিস কি, করিস কি! বিলেতেও কুস্তি লড়তিস নাকি? পায়ের এক পর্দা ছিঁড়ে গেল যে!

জিভ কেটে নিখিল তাঁর পায়ের কাছে চৌকির উপর বসে পড়ল। মাধুরী প্রণাম করছে দেখে বলল—ঈস রে, মাধুরীটা পর্যন্ত সভ্য হয়ে গেছে, আমিই কেবল পারলাম না। হ্যাঁ রে মাধুরী, গোঁফের কদ্দূর?

—এসে ধূলো পায়ে অমনি লাগলে? এ কি রকম স্বভাব তোমার, একটা মিনিট অন্তত জিরিয়ে নাও। দারুণ রাগে মাধুরী হেসে ফেলল।

গোঁফের গল্পটা বড় লজ্জার। মাধুরী এখন আর ছোটটি নয়, আর কেউ হলে ও-প্রসঙ্গ তুলতেই লজ্জা পেত। কিন্তু বিলাত ঘুরে এলে

কি হয়, নিখিলের কিছু কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে নাকি। তখন মাধুরী একেবারে ছেলেমানুষ, একবার তারাশঙ্করের পাকা গোঁফের কথায় বলেছিল, বড় হলে আমাদেরও সাদা গোঁফ উঠবে, তোমার উঠবে, আমার উঠবে—না নিখিল-দা? এইটুকু মাত্র, কিন্তু নিখিলের উদ্যমে বিশ্ব-সুদ্ধ কারোই বোধহয় এ কাহিনী জানতে বাকি নেই। তার উপরে মাঝে মাঝে আবার ভয় দেখানো আছে—চা নিয়ে আয়, নয় ত পাড়ায় গিয়ে এক্ষুনি গল্পটা বলে আসব—মোটে রাগ করতে পাবে না, রাগ যদি কখনো করেছ ত হাটে গিয়ে ঢাক পিটে বলতে বসব—সন্দেশ-টুকু খেয়ে ফেল, নইলে গল্পটা খবরের কাগজে নিশ্চয় ছাপিয়ে দেব···

মাধুরী বলতে লাগল - খবর দিয়ে দিয়ে আনলাম, নিজে ত এসো নি। কোথায় স্থির হয়ে বসবে, যুক্তি-পরামর্শ করবে—তা নয়, এসেই ঝগড়া। তুমি এমন ঝগড়া করতে পার নিখিল-দা!

নিখিল তারাশঙ্করের কাছে নালিশ করল—দেখুন ত জেঠাবাবু, একটা মাত্র গুণ আছে, একটু-আধটু ঝগড়া করতে পারি। তা-ও সইতে পারে না। যখন-তখন খোঁটা দেয়—

—তা বল্লে কি শুনি! তারাশঙ্কর স্নেহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন—তুমি বাবা গুণের জাহাজ হয়ে ফিরে এসেছ, সমস্ত শুনেছি।

নিখিল বলে উঠল—শোনা কথা বিশ্বাস করবেন না জেঠাবাবু। জানেন ত, দুমুখের শত্রু পদে পদে। আমার কোন্ শত্রু আপনার কান ভারি করে রেখেছে। বলে সে শত্রুটির দিকে তাকাল।

তারাশঙ্কর বললেন—শোনা কথা কি রকম! শোনা কথা আমি বিশ্বাস করি! খবরের কাগজে বেরিয়েছে। মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছ, বিলেতজোড়া নাম। এইবার বুড়োর চোখ ভাল করে দাও দিকি,

দেখি কেমন। মাধু-মার বিয়ে আটকে আছে ঐ জন্যে। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপ দেখতে হবে, চোখ না সারলে দেখব কি করে?

নিখিল বিস্মিত হয়ে বলল—আমি চোখ ভাল করতে পারি, খবরের কাগজে লিখেছে না কি?

তারাশঙ্কর উৎফুল্লমুখে বলতে লাগলেন—লিখেছে বই কি? আরও কত কথা লিখেছে, মাধুরী সমস্ত পড়ে শুনিয়েছে।

নিখিল বলল—তা হলে ওরই চোখের চিকিৎসা আগে দরকার জেঠাবাবু! ওর চোখ ভাল নেই।

তারাশঙ্করেরও ঠিক সেই সন্দেহ। কিন্তু সে-সব কথা উঠবার আগেই মাধুরী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—নিখিল-দা, গায়ে-মুখে-চুলে কয়লার গুঁড়ো আর ধুলোর রাশ জড়িয়ে নিয়ে এসেছ, সকলের আগে সেইগুলো ধুয়ে ফেলার দরকার। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বসে যত খুশি কুচ্ছো করো, আমি আপত্তি করব না। নিচেয় চল।

দৃষ্টির তাড়নায় উদ্ব্যস্ত করে মাধুরী তাকে নিচে পাঠাল।

পুকুর-ঘাট থেকে ফিরে নিখিল ভদ্রলোক হয়ে বসেছে। মাধুরী দেখেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিখিল বলল—কোথায় যাও?

—কোন সকালে রওনা হয়েছ। বোসো, চা-টা নিয়ে আসি।

নিখিল বলল—আর খবরের কাগজটাও—

মুখ টিপে হেসে মাধুরী বলল—বিপদে পড়ে ডেকে এনেছি; বসে বসে খবরের কাগজ পড়বার জন্য নয়।

নিখিল বলল—আগাগোড়া পড়ব না, শুধু যেখানটায় আমার ডাক্তারির গুণপনা রয়েছে। এত বড় ভাগ্য হবে, বিশ্বাস হতে চায় না। বেকার আছি, খবরের কাগজের কল্যাণে তবু যদি দু-দশটা রোগি

জোটে। তাদের শেষ করতে করতেই ছ-মাস একবছর স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

মাধুরী প্রশ্ন করল—ডাক্তার হয়েছ, সে কি মিছে কথা?

—ভুয়ো ডাক্তার। সাহিত্যের ডাক্তার, কালিদাসের কাব্যের উপর থিসিস লিখে পাওয়া। একটা ফোড়া কাটার বিদ্যেও শিখে আসি নি। কেউ আট আনার পয়সা দিয়েও ডাকবে না মাধুরী।

ঠাকুর খাবারের থালা নিয়ে এল, মাধুরী জায়গা মুছে সমস্ত সযত্নে সাজিয়ে দিল। নতমুখে খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। হঠাৎ একটু হেসে মুখ তুলে বলল—টেলিগ্রাম করে এত হাঙ্গামা করে নিয়ে এসেছি, তোমাকে সহজে ছাড়ব না নিখিল-দা। কত ভাবনা হয়েছে, জান? চোখের ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হবে।

নিখিল বলল—ভাল করতে পারব না। চোখ কাণা করে দিতে বল ত, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

মাধুরী খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল—তা হলেও চলবে। বাবাকে নয় কিন্তু! কাণা করবার অন্য সব আসামি রয়েছে।

নিখিল বলল—আমিও ঠিক সেই অনুমান করেছিলাম। চটপট সেই পাষণ্ডগুলোর ফিরিস্তি করে দাও দিকি, কাজ সেরে ফিরে যাই। বলি, কাজ শেষ হলেই ত ছুটি, অন্য কোন হাঙ্গামা নেই ত?

মাধুরী গাম্ভীর্যের ভাণ করে বলল—তাই কি কিছু বলা যায়? কত কি ঘটতে পারে! পুলিস, আদালত, জেল, দ্বীপান্তর—

নিখিল হাসিমুখে বলতে লাগল—দেশ-দেশান্তর ঘুরে এলাম, দ্বীপান্তরের ভয় করি নে, মুশকিল বাধে অন্তর-লোকের গোলমালে পড়লে। সে রকম কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না, এই ভরসা দিতে পার মাধুরী?

মাধুরী বলল—সেটাও ভেবে চিন্তে যুক্তি পরামর্শ করে দেখতে হবে। সে ত এখানে হবে না, লোকজন চাকর-বাকর···বুড়ি ঝিটা কি রকম ভাবে তাকাচ্ছে দেখ না!

—উপরে—

—সেখানে বাবা রয়েছেন।

—তাঁকে আর তাকাতে দিচ্ছি না, চোখে এক্ষুনি ঠুসি লাগাব। ঠুসি লাগিয়ে শুইয়ে রাখব। নইলে চোখ ভাল হয় কখনো? খাওয়া শেষ করে নিখিল হাসতে হাসতে পাড়ার দিকে বেরুল।

গোপীকান্ত বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা তাঁর কাছে সুবিধাজনক ঠেকল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছোকরাটা কে হে?

—ডাক্তার।

—কি এমন শক্ত রোগটা বাপু, যে দেশ-বিদেশের ডাক্তার এনে জমায়েত করছ?

নিরঞ্জন বলল—আমি আনি নি, ওঁরাই টেলিগ্রাম করে এনেছেন। বিলেত-ফেরত বড ডাক্তার, বত্রিশ টাকা ভিজিট।

—তা হলে তুমি বাবা ফেল হয়ে গেছ ত?

নিরঞ্জন মনে মনে আহত হয়ে বলল—সুযোগ পেলাম কই? চব্বিশ ঘণ্টা না কাটতেই যে ব্যবস্থা করে দিল।

হুঁ—বলে কাঁধে চাদরটা ফেলে গোপীকান্ত বেরুলেন। তারাশঙ্করকে একলাই পাওয়া গেল। বললেন—ডাক্তারকে উপরের ঘরে থাকতে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে ভায়া?

তারাশঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন—ডাক্তার কাকে বলছ? নিখিল

আমার ছেলে। হিরণের ছেলেকে আমি কি নিচের ঐ সব আস্তাবলে থাকতে দেব?

গোপীকান্ত কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন।—সে কথা নয় ভায়া, মানে···যখনই আসি যেন কুরুক্ষেত্তোর লেগে আছে। রোগির ঘরের কাছে এ রকম হল্লা হওয়া কি ভাল?

এবারে তারাশঙ্কর হাসতে লাগলেন। অসহায়ের মতো বললেন—তাই দেখ না গোপী, ওদের কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে? দু'টিতে রাতদিন খিটিমিটি···ঠেকানো যায় না।

গোপীকান্ত প্রস্তাব করলেন—আচ্ছা, না হয় আমি একবার বলে দেখি—

তারাশঙ্কর সভয়ে বলে উঠলেন—ওরে বাস রে, তা হলে রক্ষা আছে! আমি বলেছি শুনলে আমায় আর টিকতে দেবে? একজনে পুবমুখো মুখ ফিরিয়ে থাকবে, আর একজনে পশ্চিমমুখো। আমি তখন দম ফেটে মরে যাব। এ রকম অভিমানি ছেলে-মেয়ে তুমি মোটে দেখ নি, গোপীকান্ত।

পরদিন গোপীকান্তর বাড়ি নিখিলের নিমন্ত্রণ। আপ্যায়নের অবধি নেই। গোপী নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন। তারপর বললেন—আবার একদিন শিগগিরই ডেকে পাঠাব। যত কাজকর্মই থাক, আসতে হবে, বাবা। 'না' বললে শুনব না। আমায় এক্ষুনি কথা দিয়ে যেতে হবে।

বুঝতে না পেরে নিখিল মুখ তুলে তাকাল। গোপীকান্ত প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন—তারা-দাদার চোখের অবস্থা কেমন? সত্যি কথাটা বল বাবা, উতলা হয়ে আছি—

নিখিল বলল—ভাল।

গোপী বললেন—ঠিক ত? ঐ চোখের অসুখের জন্য সব আটকে রয়েছে। তারা-দাদাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তুমি বাবা তারা-দাদার বন্ধুর ছেলে, আমারও ছেলের সামিল।

নিখিল ভালমন্দ কিছু বলল না, তার মন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

গোপীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন—বিলেত থেকে কতদিন ফিরলে?

—বারোই আশ্বিন, একমাস হয় নি এখনো।

—তবে খুলেই বলি। বলে অকারণে এদিক-ওদিক চেয়ে গোপীকান্ত একটু কাষ্ঠহাসি হাসলেন। বললেন—তোমরা ভাববে, বুড়োগুলো কি রকম বেয়াদপ। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের রকম-সকম একটু আলাদা বই কি বাবা। তুমি বিলেত থেকে এসেছ, সে হল স্বাধীন-জেনানার দেশ—তোমাদের নজরে লাগে না। আর, এটা শহর হলেও মফঃস্বল শহর। নানা জনে নানা কথা বলতে পারে—

নিখিল শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কিসের কথা?

হা-হা করে গোপীকান্ত আবার এক চোট হেসে নিলেন। বললেন

—যা-হোক কিছু বললেই হল। লোকের কথার কোন মাথামুণ্ডু থাকে নাকি? আমার ছেলের কথা ছেড়ে দাও, সে লেখাপড়া শিখেছে, সে কিছু গ্রাহ্য করে না। বলে, বিশ্বাস করতে না-ই পারব ত স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি কেন? তার কথা নয়…গোলমাল বাধছে তারাশঙ্কর-দাদাকে নিয়ে। তিনি সেকেলে মানুষ—সইতে পারেন না, অথচ মুখ ফুটে বলতেও পারেন না।

নিখিলের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। বলল—জেঠাবাবু কিছু বলেছেন আপনার সঙ্গে?

—বলেছেন বৈ কি। ইদানীং রোজই বলেন। মেয়ে বয়স্থা হয়েছে, বাগ্‌দত্তা—আগে মেয়ের বাবা হও, তখন বুঝবে, বলতে হয় কি না হয়। তোমাদের সে ছেলেবয়স ত নেই—লোকে এক কথা বললে আমার মাথা হেঁট হবে, তারা-দাদারও। তারপর হঠাৎ প্রস্তাব করলেন—এক কাজ কর না কেন বাবা, আমার এখানে এসে থাক। ঘরের ছেলের মতো থাকবে—খাসা খটখটে ঘর, দক্ষিণ খোলা, সন্ধ্যেবেলা কেমন ঝির-ঝির করে হাওয়া আসে। কি বল?

নিখিল বলল—আমি আজই চলে যাব।

গোপীকান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তা-হলে তারা-দাদার চোখ?

—কলকাতা থেকে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

নিখিল ঘরে গিয়ে স্যুটকেস গোছাতে লেগেছে। গোছাবে কি—কাপড়-জামা কোন-কিছুর ঠিক-ঠিকানা নেই। যা সামনে পেল, জড়িয়ে তাল পাকিয়ে পুরে ফেলেছে। কোথায় ছিল মাধুরী, ছুটে এসে টানাটানি করে আবার সমস্ত ছড়িয়ে ফেলল।

—ওকি? অ্যাঁ? এই বিদ্যে হয়েছে—দিন-দুপুরে চুরি?

কাপড়ের আণ্ডিল থেকে বেরুল মাধুরীর কালপেড়ে শাড়ি একখানা। নিখিল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল—চিনতে পারি নি।

—শাড়ি-ধুতি চিনতে পার না, অবস্থা সঙ্গিন বলতে হবে। তোমাকেও চোখের ব্যারামে ধরল নিখিল-দা?

কিন্তু তার দিকে চেয়ে মাধুরীর চপল হাসি এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে

গেল। আয়ত চোখ-দুটি নিখিলের মুখে একাগ্র স্থাপিত করে মাধুরী বলল—কি হয়েছে নিখিল-দা?

—চলে যাচ্ছি।

—কেন?

—যাব না? আমার কাজ-কর্ম নেই বুঝি!

মাধুরী কাতরকণ্ঠে বলল—বাবার যে অসুখ।

—অসুখের ব্যবস্থা যা করছি, তুমিও জান—আমিও জানি। আর লোক ঠকাব না।

—ঈস, বড্ড যে সাধু মহাত্মা হয়ে গেছ। তবু যদি কাপড় চুরি না ধরে ফেলতাম।

মাধুরী কিছুই বুঝতে পারেনি, তবু লঘু হাস্তে ব্যাপারটা কেবলই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

নিখিল গভীর স্বরে বলল—সে ত ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম মাধুরী। পরের জিনিসে লোভ করতে নেই। তোমার শাড়ি এই রইল। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে-শান্তিতে থাক। চারটের গাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি।

মাধুরী একেবারে ভেঙে পড়ল—রাগ করে যাচ্ছ? আমায় ভাসিয়ে দিয়ে? আমি যে কিছু বলতে পারি নি—কত কথা রয়েছে, বুক ফেটে মরে যাচ্ছি—

নিখিল ধরা গলায় বলল—বল নি কেন?

—তুমি রাতদিন ঝগড়া কর, বলব কোন সময়? গম্ভীর কথা বলতে ভয় করে, পাছে তুমি হেসে ফেল।...নিখিল-দা, সত্যি তুমি আর আসবে না?

নিখিল কান্নার মতো করুণ হাসি হেসে বলল—আসব বৈকি, নেমন্তন্ন খেতে আসব। অবশ্য বিয়ের খবরটা যদি গিয়ে পৌছয়।

মাধুরী রাগ করে উঠে দাঁড়াল।—তোমরা সব ঐ রকম...জানি, জানি, সবাই তোমরা স্বার্থপর। ওষ্ঠ তার বার দুই কেঁপে উঠল, দু-চোখে জলের ধারা নামল। বলল—বিয়েব নয়, মরার খবর পাবে—ঠিক পাবে। তখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ো—আর কেউ কোনদিন ডেকে পাঠাবে না, কাজ-কর্মে ব্যাঘাত হবে না—

কাঁদতে কাঁদতে দ্রুতপদে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সামনের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। নিখিলও চেয়ে দেখল। সর্বনাশ—তারাশঙ্কর উঠে এসেছেন, চোখেব ঢাকা খুলে ফেলেছেন।

নিশ্বাস ফেলে যথাসম্ভব সহজ সুরে নিখিল বলল—আজ চলে যাচ্ছি জেঠাবাবু। মাধুবী বলে, যেওনা, বাবার চোখের তা-হলে কি হবে ?

মাধুরী বলল—বাবা, তুমি চোখ খুলে ফেলেছ—অসুখ আবার বেড়ে যাবে কিন্তু। আমবা ভাবছি, তুমি ঘুমিয়ে আছ।

তারাশঙ্করের মুখে চিন্তার ছায়া। হাসতে গেলেন, কিন্তু হাসি ফুটল না। বললেন—যা তোরা ঝগড়া লাগিয়েছিস, ঘুমোবাব জো আছে ?

—আচ্ছা, ঝগড়া করব না। তুমি ঘুমোও গে, নইলে চোখে যন্ত্রণা হবে।

—না রে। চোখ এবার সেবে গেছে বলেই ঠেকছে।

চাকর খবর আনল, গোপীকান্ত এসেছেন, নিচে আছেন, জরুরি দরকার।

তারাশঙ্কর বললেন—বোস তোমরা। আমি এক্ষুনি আসছি। কথা আছে, বোস।

গোপীকান্ত ক-দিন আগেকার খবরের কাগজ থেকে একটা চিহ্নিত অংশ বের করে ধরলেন। বললেন—ভয়ানক জোচ্চুরি ব্যাপার ভাই, দেখ একবার কাণ্ডটা। আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। *

—না রে, চোখ এবারে সেরে গেছে বলেই ঠেকছে।

তারাশঙ্কর চেয়েও দেখলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

—নিখিলচন্দ্রের কীর্তি দেখ। বারোই আশ্বিন ফিরেছে, তেরোই

তারিখের কাগজে সব বেরিয়েছে। চোখের ডাক্তার না কচু। বিলেত থেকে শুধু একটা খেতাব নিয়ে এসেছে, আর কিছু নয়। এখন কলেজে মাস্টারি করে খেতে হবে। মিছে তোমায় ভুগিয়ে মেরেছে।

—তা হোক, তা হোক, চোখ কিন্তু আমার ঠিক সেরে দিয়েছে। তারাশঙ্কর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বললেন—কাছের জিনিসটাও দেখতে পেতাম না গোপী, এখন সমস্ত স্পষ্ট দেখছি।

ড্রয়ার খুলে কয়েকখানা নোট তিনি গোপীকান্তের হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন—নিরঞ্জন টের করেছে, খবর পেয়ে অন্দুর থেকে ছুটে এসেছে। ভিজিট বলে দিচ্ছি না, আনন্দের দিনে সন্দেশ খেতে দিলাম। তাকে বলে দিও, আর তাব দরকার হবে না—সে মোকামে চলে যাক।

—মোকামে যাবে? গোপীকান্ত কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেছেন। বললেন—কিন্তু এখানে থাকতে থাকতে পাকা-দেখাটা হয়ে গেলে হত না?

তারাশঙ্কর বললেন—দেখা আমার পাকাই হয়েছে। তাব নড-চড হবে না। শুভ-কর্মের সময় নিরঞ্জন বাবাজি যেন আসেন। তাকে বলে দিও। আর তোমাকেও দেখে শুনে সমস্ত সমাধা করে দিতে হবে। তুমি আমার পুরাণো বন্ধু।

আর ধৈর্যের বাঁধ থাকল না। আগুন হয়ে গোপীকান্ত বললেন—বর তা হলে ঐ জোচ্চোরটা?

হাসিমুখে তারাশঙ্কর বলতে লাগলেন—তা হোক, তা হোক, জোচ্চোর হলেও চোখের চিকিৎসা কিন্তু ঠিকই করেছে—
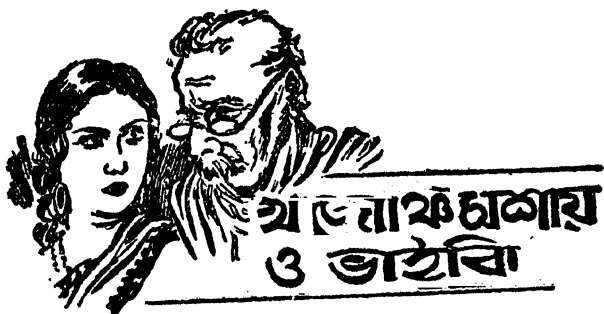
ছোট শহর, দু'টি মাত্র পাকা রাস্তা; রাস্তায় কেরোসিনের আলো সব সাকুল্যে গোটা কুড়ির বেশী নয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মিস্ত্রি-মজুর তো অনেকেই। তারা অত শত বোঝে না, জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ মশাই, চাকরিটায় মাইনে কত?

বিমানবিহারী জবাব দেয়—এক পয়সাও নয় ভাই। এ শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না। বিমান জমিদারের ছেলে, কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করত। এই কিছুদিন হল, বাড়ি এসে জমিদারি দেখতে আরম্ভ করেছে। জমিদারির কতদূর কি বোঝে, সে বলতে পারবেন বুড়া খাজাঞ্চি গোপাল ঘোষ। আরও অনেকে হয় ত পারবে, কিন্তু সে যাই হোক, তার মোটরের হর্ন শুনলে কাছারির আমলা-গোমস্তা মায় ম্যানেজারকে অবধি তটস্থ হতে হয়। বুড়ো কর্তা শ্রীনাথ রায় অবধি ছেলের সামনে কথা বলতে ভরসা পান

না। যে দুটো পাকা রাস্তা আছে, তার উপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধূলোর ঝড় উড়িয়ে বিমান মোটর হাঁকিয়ে বেড়াত। সেই লোক ইদানীং খদ্দর পরে গান্ধি-টুপি মাথায় দিয়ে পায়ে হেঁটে জনে জনের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে, বিনা-লাভে মহিষ তাড়াবার এমন উৎসাহ কলিকালের দিনে আর দেখা যায় না। চোখ টিপে একজন মন্তব্য করল—আছে, আছে গো···মাইনে না থাক, দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক আছে বই কি!

আস্তে বললেও কথাটা বিমানের কানে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার করে নিল—আছেই তো, ঠিক বলেছ ভাই। সেই লোভেই সামলা-ছেঁড়া ছোকরা উকিলের দল উঠে পড়ে লেগেছে। আর যেখানে এক টাকা দিলে হয়, তোমরা সেখানে চার টাকা ট্যাক্স দিয়ে মরছ।

ছোকরা উকিলই বটে, কিন্তু দলসুদ্ধ নয়—একটি মাত্র লোক। সে কিশোরীলাল। বিমান বুঝল, কিশোরীলাল সম্বন্ধে বিষোদ্গার কেউই কানে নিচ্ছে না। কিন্তু এই সব বলতেই তো আসা! বলতে লাগল—সে রকম আর হবে না ভাই সকল। তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, জান ত সবাই—পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না। উপরি আয়ের কি দরকার আমার? নতুন বাজেটের সময় ট্যাক্স এবার অর্ধেক কমিয়ে দেব।

বিমান উঠে যেতে খুব হাসাহাসি আরম্ভ হল। একজন বলল—চোর সবাই। কিশোরীবাবুও যে সাধু, তা বিশ্বাস করি নে—যে যাই বল। তবে তার হল ছেঁড়া জামা আর পাঁচসিকের জুতো। ওই জামা-জুতোর দামটাই না হয় সে উশুল করবে। তুমি বাবা জমিদারের

ছেলে, হেঁ হেঁ, তুমি গেলে মোটরের তেল জোগাতে আমাদের হাড় ক-খানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

এই মহাযুদ্ধে অনেক উলুখড়ের বিষম বিপদ হয়েছে, তিনি ঐ গোপাল খাজাঞ্চি। পঁচিশ বৎসর চাকরির মধ্যে এমন অঘটন আর কখনও ঘটেনি। অপরাধের মধ্যে কিশোরীলালের খুড়া তিনি। কেবল খুড়া বললেই হবে না, বাপের চেয়ে বেশি। গোপাল জমা-ওয়াশিল-বাকি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, বিয়ে করবার ফুরসৎ হল না। গান-বাজনা করতে জানেন না, কিন্তু ঐ বিষয়ে অনুরাগ খুব। আনুষঙ্গিক আর একটা শখ আছে, বটতলার বাছা বাছা গানের বই ও নাটক পড়া। এরই উপর এসেছে কিশোরীলাল ও বনমালা,—ভাই-বোন দু'টি। বছর দশেক আগে তারা মা-বাপ হারিয়েছে, এই দশ বছর ধরে গোপাল ঐ মনিব দু'টির কাছে বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন। অত ভয় তিনি শ্রীনাথ রায়কেও করেন না।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে গোপাল গড়গড়ার নলটি কেবল মুখে ধরেছেন, বনমালা অগ্নিমূর্তিতে এসে দাঁড়াল।

—শুনেছেন কাকাবাবু?

—নল মুখ থেকে পড়ে গেল।

—বিমানবাবু নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, 'পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে—

কবিতা শুনে গোপাল মহা খুশি হয়ে উঠলেন।—বলেছে নাকি? তা হলে পড়াশুনো করেছে কিছু কিছু। আমি ভাবতাম, কলকাতায় বসে বসে খালি ঘাস কাটত।

নিজের রসিকতায় গোপাল নিজেই হেসে উঠলেন। বললেন—

বড্ড খাসা পদ্য রে, অমন আর হয় না। ওর পরের ছত্র বলতে পারিস মালা ?

তাঁর উল্লাসে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে বনমালা বলতে লাগল—আর বলেছেন, তুমি নাকি তাঁদের এস্টেটের টাকা ভেঙে দাদার ইলেকশনের জন্য খরচ করছ।

—বলেছে নাকি ? গোপালের মুখের হাসি নিভে গেল, বললেন —এটা মিথ্যে কথা। কিশোরী ত একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে নেয় না।

বনমালা বলল—আচ্ছা কাকাবাবু, এই বুড়োবয়সে তোমার চাকরির দরকারটা কি ?

গোপাল ঘাড় নেড়ে বললেন —কিছু না, কিছু না।

কিশোরী কোর্টে যায় নি, কোন্ দিক দিয়ে এসে অতি সংক্ষেপে সে রায় দিল—ওই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা।

চাদরটা কাঁধে ফেলে গোপাল তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে তবে হাঁপ ছাড়লেন। জমিদার-বাড়ি এসে চুপি চুপি মহেশ দারোয়ানের কাছে শুনলেন, সংবাদ বড় শুভ—বিমান বাড়িতে নেই, দুপুরে ছুটো নাকে-মুখে গুঁজে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনাথ উপরে আছেন, তিনিও নামেন নি।

তিন-চার জনে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা কাঁধে ভিতরে ঢুকল।

—ব্যাপার কি ?

মহেশ বলল—শোনেন নি খাজাঞ্চিবাবু ? মঙ্গলবারে যাত্রা হবে।

গোপাল উৎসাহিত. হয়ে উঠলেন—বলিস কি! কার দল? কি পালা হবে, শুনেছিস কিছু?

মহেশ বিরক্তমুখে বলতে লাগল—জ্বালাতন আর কি! মঙ্গলবারে সমস্ত রাত জেগে আবার বুধবারে ওই হাঙ্গামা। আমাদের যেন মানুষের শরীর নয়। বড়বাবুর বিচার-বিবেচনা নেই।

তখন মনে পড়ল, ইলেকশন ত বুধবারে। তার অবশ্য পাঁচ দিন বাকি। গোপাল চিন্তিত ভাবে বললেন—গোলমালের মধ্যে যাত্রা কি জমবে? কর্তামশায়ের খেয়াল হয়েছে বোধ হয়। নইলে আর এমন বুদ্ধি কার?

- দেখি দেখি, হিসেবটা কিসের।

মহেশ বলল—বুদ্ধি বড়বাবুর। যাত্রা না ঘোড়ার ডিম। যারা ভোট দেবে, যাত্রার নাম করে তাদের রাত্রি থেকেই আটকে রাখবার

ফিকির। সকালবেলা গাড়িতে পুরে পুরে চালান করবে। মিষ্টি-মণ্ডা খেয়ে ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। একটু চুপ করে থেকে বলল—বুদ্ধিটা খুব ভাল। কিন্তু আমাদের যে জানে কুলোয় না।

কাছারি-ঘরে ঢুকে গোপাল হাতবাক্সর সামনে বসলেন। বাঁ দিকে রাশীকৃত কান-ফোঁড়া খাতা। সেই সব খাতার নিচে আছে অভিমন্যু বধ গীতাভিনয়। হাতবাক্সে কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে গোপাল বই খুলে বসলেন। তারপর কর্তা নামলেন, নেমে বৈঠকখানার দিকে গেলেন। গোপাল চোখ না তুলেই সমস্ত টের পাচ্ছেন। চোখ তোলবার জো নেই; খাসা জমেছে বইখানা, বড় চমৎকার বই।

একটু পরেই ডাক এল – গোপাল!

—আজ্ঞে, যাই।

আরও পাতা দুই এগিয়েছে। কর্তা আবার ডাকলেন—কই গো, কি করছ তুমি?

রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গোপাল জবাব দিলেন—একটা জরুরি হিসেব দেখছি, দেরি হবে।

মিনিটখানেক পরে প্রবল হাসির সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ তুলে দেখেন শ্রীনাথ স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন—আ-হা-হা ঢাকছ কেন? দেখি দেখি, হিসেবটা কিসের! পরশু থেকে বইটা উড়ে গেছে; তখনই জানি, গোপালচন্দোর ঐ নিয়ে হিসেব ধরছেন। বলি, এমন অভিনিবেশ ইস্কুলে পড়বার সময় ছিল কোথায়? তা হলে যে চাই কি একটা হাকিম হয়ে বসতে পারতে!

বুড়োর দু-হাতে দু'টা রেকাব। একটা হাতবাক্সর উপর রেখে বললেন—লুচি ন্যাকড়া হয়ে যাচ্ছে, ও নড়বড়ে দাঁতে ছিঁড়বে না কিন্তু।

হিসেবটা না হয় দু-মিনিট বন্ধ থাকুক। ওরে হীরু, জল দিয়ে যা দু-গ্লাস।

মহানন্দে আহার চলেছে, এমন সময়ে সুতীব্র আলোয় সমস্ত উঠান উদ্ভাসিত করে বিমানবিহারীর মোটর এসে দাঁড়াল। জুতোর আওয়াজে মার্বেলের মেজে কাঁপিয়ে সোজা সে এসে দাঁড়াল কাছারি-ঘরের মধ্যে।

ইতিমধ্যে জাদুমন্ত্রে যেন সেখানকার অবস্থা বদলে গেছে। শ্রীনাথের হাতের রেকাবি ঢুকেছে তক্তাপোষের তলায়, আর গোপালেরটা গেছে খাতাপত্রের আড়ালে। হাতের কাছে এক আদালতের সমন পেয়ে গোপাল তারই উপর শশব্যস্তে যোগ দিয়ে চলেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বিমান বলল—এখানে কি বাবা?

শ্রীনাথ বললেন—জলকরের হিসাব নিচ্ছি। তুমি যাও বাবা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও গে।

বিমান বলল—ঠাণ্ডা হব কি, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। সমস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম, কোন আশা নেই।

শ্রীনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার ছেলের দিকে আর একবার গোপালের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—তা হলে কি হবে?

—এমন কিছু হবে না। কিশোরী জিতবে, আমি বিষ খাব। বলে গোপালের দিকে কঠোর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিমান গট-মট করে উপরে উঠে গেল।

গোপাল নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। শ্রীনাথ বলতে লাগলেন—পাগল, পাগল! আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা বেশ

ছিলাম। আমরা খেতাম, ঘুমোতাম, পাশা খেলতাম, কোন হাঙ্গাম ছিল না। কি বল হে গোপাল?

গোপাল ততক্ষণে পুনশ্চ গীতাভিনয় খুলে বসেছেন। শ্রীনাথের কথা তাঁর কানেই গেল না। বললেন—কর্তা মশায়, যাত্রায় কি পালা হবে ঠিক করলেন? অভিমন্যু-বধ হোক না, খাসা জমবে।

—বেশ, বেশ। তোমরাই ঠিক কর। তারপর গোপালের হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন—ওঠ হে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কত কাজ করবে? চল, একহাত পাশায় বসি গে।

হাতবাক্স ও লোহার সিন্দুকে চাবি এঁটে সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে, এর মধ্যে বিমান আবার নেমে এল। এ সময়ে তার নামবার কথা নয়, আজ তার চোখে মুখে যেন আগুন ফুটে বেরুচ্ছে। এসে গম্ভীরভাবে চেয়ার টেনে বসল। গোপালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—খাজাঞ্চি মশায়, কিশোরীকে বলেছিলেন সে কথা?

গোপাল ঘাড় নাড়লেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীনাথ বললেন—কি কথা বাবা?

বিমান বলতে লাগল—আমার চিরশত্রু কিশোরী। কলেজে পাশাপাশি বসতাম, ও ক্লাসে বসে ঝিমোত, ক্লাসের বাইরে হৈ-হৈ করে বেড়াত, আর আমি সমস্ত রাত জেগে পড়তাম। তবু সে কোন বার আমায় ফার্স্ট হতে দেয় নি। এবার ইলেকশন হচ্ছে, তাতেও সে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। নতুন উকিল হয়ে এসেছে, যাতে প্র্যাকটিশ জমে সেই ত তার দেখা উচিত। আমি বরং দু-দশ জনকে বলে দেব। এই আমাদের এস্টেটেই কত কাজকর্ম রয়েছে। এসব হাঙ্গামে দরকারটা কি? সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলেন খাজাঞ্চি মশায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সরে দাঁড়াতে রাজি হয়েছে?

গোপাল মৃদুস্বরে বললেন—আজ্ঞে।

উৎসাহের প্রাবল্যে বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—বেশ বেশ, তবে আর কি! তা হলে লিখে দিক একটা-কিছু, আমি কালই ছাপিয়ে বিলি করে দেব। হঠাৎ গোপালের মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হল। বলল—আপনি বলেন নি বোধ হয় খাজাঞ্চি মশায়?

গোপাল সভয়ে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, বলব।

মুহূর্তে বিমানের দৃষ্টি রুক্ষ, স্বর কঠোর হয়ে উঠল।—বলবেন বই-কি! কিশোরী কেল্লা-ফতে করুক, এই সব বলে বলে হাসি-ঠাট্টা করবেন। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠল—ওঃ, জলকরের নিকেশ নেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? খাতাগুলো আর একবার দয়া করে বের করতে হবে। আমি একবার দেখতে চাই।

সকলে নির্বাক। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাটির দিকে তাকিয়ে বিমান মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল; তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুতবেগে উঠান পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। খাতা বের করবার অপেক্ষায় রইল না।

এরই দিন দুই পরে এক কাণ্ড হয়ে গেল। গোপাল সম্প্রতি নদীর ধারে নূতন বাড়ি করেছেন। বিমান শুনেছে কথাটা, কিন্তু তেমন কানে নেয় নি। তারা এক একটা রাস্তা ধরে ঘুরছিল। তখন আসন্ন সন্ধ্যা, নদীর জল ডুবন্ত সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। বিমান আর জন দুই-তিনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল গোপালের বাড়ি। নিচের তলায় কেউ নেই, ঘর-দোর হাঁ-হাঁ করছে।

অক্ষয় সন্দেহ প্রকাশ করল—এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে ভূপাল

পা? কখনো নয়। আড়তদার মানুষ, এ রকম পছন্দ পাবে কোত্থেকে?

ফিরে যাবে মনে করছে, এমন সময় আলো হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বনমালা। বিমান চেনে না, কিন্তু বনমালা তাকে চিনতে পারল। ছোটবেলায় কতবার সে গোপালের সঙ্গে জমিদার-বাড়ি গিয়েছে, বিমান ছুটিতে বাড়ি আসত, সেই সময় তাকে দেখেছে। বনমালা বলল—আসুন! আলো রেখে সকলকে চেয়ার দেখিয়ে দিল। —কি দরকার বলুন ত?

এমন সপ্রতিভ মেয়ে বিমান খুব কম দেখেছে। এ রকম জায়গায় ত আশাই করা যায় না। ছাপানো নানা রকম নিবেদনপত্র তারা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল; একজনে তার একখানা বনমালার হাতে দিল।

বনমালা হেসে বলল—ভোট চাইতে এসেছেন?

বিমান বলল—বুঝছেন ত দুর্ভোগ! বাড়ির কর্তারা কোথায়?

বনমালা বলল—এখন কেউ নেই। থাকুন আর না থাকুন, এ বাড়ির ভোট আপনি ত পাবেন না।

এ রকম স্পষ্টভাষায় কেউ 'না' বলে না। স্বীকার করে, এমন কি দিব্যি করে বলতেও অনেকে গররাজি নয়। যদিও বিমান জানে, সেই দিব্যি-ওয়ালাদের শতকরা নব্বই জন ভিন্ন দলের। বিমান চমকে গেল। বলল—ভোট পাব না, কারণটা শুনতে পাই?

বনমালা বলল—কারণ একটা নয় ত। প্রথমত আপনি বড়লোক, অতএব ভিন্ন জাত—

বিমানবিহারী অধীরভাবে তর্ক আরম্ভ করল—কেন, বড়লোক

হওয়া কি অপরাধ? বড়লোক হলে মানুষ হতে নেই? এসব ধারণা কেন আপনাদের হয়? কে বলে বেড়ায় এসব?

বনমালা বলল—আচ্ছা, এ বিচার না হয় আর একদিন হবে। আজ আপনার অনেক কাজ। বরঞ্চ অন্য কোথাও গিয়ে ভোটের চেষ্টা করলে মিছামিছি সময় নষ্ট হবে না।

বিমান আরও চেপে বসল।—থাকুক কাজ। চাই না অন্যের ভোট। খান-দুই মোটর আছে বলেই আপনাদের ভোট পাবার অনধিকারী নই, এইটে প্রমাণ করে তবে আজ এখান থেকে উঠব।

বনমালা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলে—প্রমাণ করলেও ভোট পাবেন না। যেহেতু এটা গোপাল ঘোষের বাড়ি। কিশোরী লাল ঘোষ আমার দাদা।

বাড়িতে কেউ নেই, এটা বনমালা মিথ্যা বলেছিল। গোপাল ছিলেন, তিনি এসব টের পান নি। তিনি উপরে ছিলেন। বনমালা বলল—শোন কাকাবাবু, আজ মজা হয়েছে। বিমানবাবু এসে হাজির। বলেন, ভোট দাও। তারপর হেসে বলল—আমার ভোটটা আমি ওঁকে দেব ভাবছি।

গোপাল সায় দিয়ে বললেন—দেওয়া ত উচিত। কিশোরী যদি এই খেয়ালটা ছাড়ত, আমার ভোটও ওকে দিতাম। বড্ড ভাল ছেলে।

বনমালা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল—ভাল না ছাই। কি বলছিল, জান?

গোপাল রীতিমত চটে উঠলেন।—বলেছে তা গায়ে ফোস্কা উঠেছে নাকি? অমন ঢের ঢের বলে থাকে। আমাদের সময় কি হত? তখন ভোটের কুরুক্ষেত্তোর ছিল না, বেধে যেত তবলার বোল,

কি পাশার দান নিয়ে। তোদের আমলে খালি মুখের কথা—আমাদের বেলায় হাতাহাতি হয়ে যেত।

পরদিন বাপের সঙ্গে দেখা হতেই বিমান বলল—খাজাঞ্চি মশায়ের বাড়িখানা দেখেছ?

শ্রীনাথ উৎসাহ ভরে বলতে লাগলেন—খাসা বাড়ি। আমায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। যাই বল বাবা, আমাদের বাড়ি বড় বটে—কিন্তু গোপালের বাড়ি ছোট হলেও ছবির মতো। আমার ত ইচ্ছে করে, ওই রকম একটা জায়গা পেলে রাতদিন গিয়ে থাকি।

বিমানের মুখের দিকে চেয়ে বুড়োর কথা বন্ধ হল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বিমান বলল—বাড়ি ভাল, তা জানি। কিন্তু উনি মাইনে পান কত?

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন—তিরিশ বোধ হয়।

বিমান বলল—তিরিশ নয়, আটাশ টাকা। তাও আট মাস বাকি পড়ে রয়েছে, নিয়ে যাবার ফুরসৎ হয় না! পাঁচ বছরের কাগজ উল্টে দেখলাম, বরাবর পূজার সময় একসঙ্গে বারো মাসের মাইনে নিয়ে যান। বাকি এগার মাস কি করে চলে তা হলে?

সে কৈফিয়ৎ যেন শ্রীনাথের দেবার কথা। বলতে লাগলেন—জমা-জমি আছে কিছু-কিছু। কিশোরীও রোজগার করছে।

—আর বাড়ি?

—করেছে একরকম করে! বাড়ি-ভাড়া লাগে না, তাই চলে যায়।

কঠোর কণ্ঠে বিমান বলল—কিসে চলে, তা বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। কিন্তু বড্ড সেয়ানা, কাগজপত্রে ধরা-ছোঁওয়া পাচ্ছি না। যাই হোক বাবা, নতুন খাজাঞ্চি রাখতে হবে; এস্টেট ফাঁক করে

দিচ্ছেন। কাঁচা পয়সা নইলে কিশোরী অমন করে দু-হাতে ছড়াতে পারে? কোর্ট থেকে নিজে যা আয় করে, সে তো আমার অজানা নেই!

একটু পরেই হেলতে দুলতে পান চিবাতে চিবাতে গোপাল এসে উঠলেন। বাপে ছেলেয় তখনও কথাবার্তা হচ্ছে। প্রথমটা গোপাল বিমানকে দেখেন নি, তারপর দেখতে পেয়ে পাশ কাটাবার উদ্যোগে ছিলেন। বিমান ডাকল, শুনুন খাজাঞ্চি মশায়—

গোপাল তটস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি ইংরেজি জানেন না। তাতে এষ্টেটের কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা একজন ইংরেজি-জানা ক্যাশিয়ার রাখব।

গোপাল জবাব দিলেন, আজ্ঞে।

আজই আপনি ম্যানেজারের কাছে চার্জ বুঝে দেবেন। খেসারত হিসাবে আপনাকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে।

মাথা নিচু করে গোপাল বললেন, যে আজ্ঞে।

তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরে ঢুকে পড়তে পারলে গোপাল বাঁচেন। পিছন হতে বিমান বলল, বেলা হয়ে গেছে, এখন আর কাজ নেই— বিকেলেই সমস্ত বুঝিয়ে দেবেন তা হলে।

শ্রীনাথ চুপচাপই ছিলেন, কিন্তু বড় কটু হয়ে উঠছে দেখে আর কথা না বলে পারলেন না। বললেন, অর্থাৎ তুমিই বলছিলে না গোপাল, চাকরি আর ভাল লাগে না। সেই কথা হচ্ছিল আর কি! তা তোমার যদি ইংরেজি-জানা তেমন কেউ থাকে, বরং—

বিদ্রূপের হাসি হেসে বিমান বলল, তা কিশোরী যদি আসে, চাকরিটা তাকে দিতে পারি। কোর্টে যা পায়, তার চেয়ে মন্দ [illegible] না।

সময় নষ্ট করবার লোক গোপাল নন, ঘরে ঢুকেই যথারীতি অভিমন্যু-বধ খুলে বসেছেন। হরিচরণ মুহুরি অনেক দিনের লোক, গোপালকে বড় ভালবাসে। এগিয়ে এসে ফিস-ফিস করে বলল, খাজাঞ্চি মশায়, বিমানবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন একবার।

মুখ না তুলে গোপাল বললেন, কি বলব আবার?

হরিচরণ বলতে লাগল, বাইরেটাই ওঁর ওই রকম। আসলে বড়বা' লোক খারাপ নন। ইলেকশন নিয়ে মেজাজ বিগড়ে আছে কিনা।

থাকুক গে। বলে গোপাল গীতাভিনয়ের পাতা উল্টালেন।

বিমান কিন্তু ভুলে যায় নি। পরদিন আবার গোপালকে ধরে বসল, খাজাঞ্চি মশায়, ম্যানেজার বলছিল—আপনি হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন নি।

গোপাল বললেন, আজ্ঞে না।

আজই দেবেন।

ঘাড় নেড়ে গোপাল ঘরে গিয়ে উঠলেন।

মঙ্গলবার সকালবেলা দল এসে পড়ল। অধিকারির গলায় বাইশ-খানা মেডেল। গোপাল সেদিন দুপুরে ঘুমুলেন না, খেয়ে উঠেই অমনি াদর কাঁধে ফেললেন। বনমালা রান্নাঘরের দিকে ছিল, যেন হাত গুণে টের পায়, সে ঝগড়া করতে এসে দাঁড়াল।

এক্ষুণি চললে যে!

গোপাল সভয়ে বললেন, জানিস নে তো কত কাজ!

কাজ, কাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি, এত কাজের দরকারটা

গোপাল হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, দরকার কি, শোন কথা! বলি টাকাটা তো খোলাম-কুচি নয়—না খাটলে টাকা দেবে কেন?

ফলে উল্টা উৎপত্তি হল। মেয়ের অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলে, কাকাবাবু, আমরা অনেক খাই, বুড়ো বয়সে তাই তোমায় অমন করে খেটে মরতে হয়। বেশ, এখন থেকে একবেলা করে খাব। আসুক দাদা—

খেটে মরি আমি? গোপাল এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। গোপালচন্দোর খেটে চাকরি করে, এ তো শ্রীনাথ রায়ও বলতে পারবে না। সকাল সকাল যাচ্ছি, সে না খাটবার ফিকির রে—সবাই রাত জেগে মরবে, আমি ন'টা না বাজতেই চলে আসব, দেখিস।

যাত্রা বিকালবেলা থেকে হবার কথা, কিন্তু আরম্ভ হতেই সাড়ে আটটা। গোপাল নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, তাই তো, গান শোনা হবে আর কখন, আসর-বন্দনাতেই আধ-ঘণ্টা কাটবে। রোয়াকের উপর একখানা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শুনছিলেন। তারপর উত্তরা এসে গলা কাঁপিয়ে গান ধরল। ঐ ছোকরাই গোপালের কাছে একটা বিড়ি চেয়েছিল বটে, গোপাল হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। সে যে এমন খাসা গান গায়! গোপাল আর ওরকম ভাবে থাকতে পারলেন না, উঠানে আসরের মধ্যে এসে চেপে বসলেন। ঘড়িতে ন'টা-দশটা বেজেই চলল, গোপালের খেয়াল নেই।

মহেশ দরোয়ান এসে বলল, বড়বাবু ডাকছেন।

গোপাল অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন, যাচ্ছি।

আবার খানিক পরে মহেশ এসে ডাকল, কই গো খাজাঞ্চি মশায়, বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, বড্ড দরকার, শিগগির আসুন।

গোপাল ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, একশ বার এক কথা! বললাম তো যাচ্ছি। তালুক লাটে উঠেছে নাকি?

মহেশ বলল, কথাটা কানে নেন নি, বড়বাবু ডাকছেন, কর্তামশাই নন।

কিন্তু পাণ্ডবদের তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, অভিমন্যু ব্যূহভেদের উদ্যোগে আছেন। গোপাল মহেশের কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন, হোকগে বড়বাবু। বড়বাবু তা ফাঁসি দেবেন না তো? বল গে যেয়ে, এখন হবে না, চার্জ সকালবেলা বুঝিয়ে দেব।

মহেশ হঠাৎ ত্রস্তভাবে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। গোপাল ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বিমানবিহারী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে। আসরের মধ্যে সে এসে দাঁড়াবে, এটা একেবারে অভাবিত। আরও আশ্চর্য—কণ্ঠস্বর তার মোলায়েম। বলল, একটুখানি না উঠলে তো হবে না খাজাঞ্চি মশায়—

আজ্ঞে। গোপাল তৎক্ষণাৎ উঠে বিমানের পিছু-পিছু চললেন। অভিমন্যু তখন ব্যূহের সামনে খুব লম্ফ-ঝম্প সহকারে অ্যাক্টো করে বেড়াচ্ছে। রোয়াকে উঠে গোপাল একবার পিছন ফিরে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললেন।...বিমান এ কোথায় নিয়ে যায়? এ যে উপরে চলল! সেখানে বারান্দার উপরে একখানা সোফা বিমান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সবনাশ! বনমালা এসে বসে আছে।

গোপালের রাগ হল। বললেন, ভোট দিবি, দিস। তা এখানে আসবার দরকার কি?

বিমানের মুখ হাসিতে ভরে গেল।

আপনি ভোট দেবেন আমাকে?

বনমালা জবাব না দিতে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোপাল বলতে লাগলেন, দেবে বই কি! আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, সোজা কথা! ও বলেছে, ওর ভোটটা আপনাকেই দেবে। আবার তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া!

বনমালার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল, ঝগড়া হয় সাধে! ঝগড়া না করে উপায় আছে তোমার সঙ্গে? রাত্রি ক-টা বাজল কাকাবাবু?

গোপাল বললেন, বলেছি তো ফিরতে ন'টা হবে। তাই বুঝি ছুটে আসা হয়েছে?

বনমালা বিমানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলতে লাগল, আসব না তো বুড়োবয়সে রাত জাগিয়ে তোমায় মেরে ফেলবে, বসে বসে তাই দেখতে হবে নাকি? বাড়ি চল কাকাবাবু, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কানাই গাড়িতে বসে—

বিমানের অপরাধ নেই, সে তো গোপালকে থাকতে বলে নি। কিন্তু সে রাগ করল না। বলল, বাড়ি যাবেন কি রকম? ভোট দেবেন যখন বলেছেন, এইখানে থাকতে হবে।

বনমালা হাসিমুখে বলল, আটকে রাখবেন নাকি?

নিশ্চয়। যত ভোটার কেউ যেতে পারবে না। সবাইকে যাত্রা শুনতে হবে। কাল ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। তারপর হেসে

উঠে বলল, মা, জেঠাইমা, ওঁদের সঙ্গে বসে যাত্রা শুনুনগে, যান।

গোপাল মহানন্দে সায় দিয়ে উঠলেন।

সেই ভাল, পালাটা জমেছে।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে উঠে দাঁড়াল। বিমানের নির্দেশ মতো যাত্রা শুনতে না বসে গোপালের হাত ধরে বলল, বাড়ি চল।

এই রকম ক্ষেত্রে গোপাল কাউকে ভয় করেন না। হেঁকে উঠলেন, বলছি তো, রাত্তির হবে—ন'টার আগে ফিরব না।

ন'টা বেজে গেছে দেড় ঘণ্টা আগে। বনমালা দেয়াল-ঘড়িটা আঙ ল দিয়ে দেখাল।

হুঁ, বাজলেই হল! অভিমন্যু এখনও ব্যূহের বাইরে রয়েছে, ঐ ব্যূহ ভেদ হবে, তারপর অভিমন্যু-বধ, তারপর জরাসন্ধ-বধ। ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমি তার করব কি?

বিমান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। সমর্থনের আশায় তাব দিকে তাকিয়ে গোপাল বললেন, যাঁদের চাকবি কবি, কাল তাঁদেব মহামারী কাণ্ড। তাতে আধঘণ্টা যদি দেরিই হয়, কি হবে?

চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। পঁচিশ বছর শরীরপাত কবেছ, আর করতে দেব না।

গোপাল বললেন, দেব তাই। যাত্রা ভেঙে যাক, কাল সকালে দেব।

কোনদিক থেকে শ্রীনাথ সেই সময়টা এসে পড়লেন। তিনি বলে উঠলেন, সেই ভাল। আমিও ইস্তফা দেব। তারপব বুঝলে গোপাল, দু-জনে কাশী গিয়ে সেখানে পাশার ছক পেতে নেব। বলতে বলতে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, সে কি করে হবে? ভেবে দেখলাম, ওঁকে ছাড়লে মুশকিল হবে। আমরা আগে কাজকর্ম শিখে নিই ভাল করে। তারপর গোপালের দিকে চেয়ে বলল, বুঝলেন খাজাঞ্চি মশায়, চাকরি আপনি ছাড়তে পারবেন না।

যে আজ্ঞে—বলে গোপাল সসম্ভ্রমে ঘাড় নাড়লেন।

বিমান বলতে লাগল, আর ভেবে দেখলাম, মিউনিসিপ্যালিটিতে যাওয়া আমার পোষাবে না। কিশোরী যাক। ঘরের খেয়ে কে অত খাটবে? যত ভোটার এসেছে, যাত্রা থামিয়ে এখনই সকলকে বলে দিচ্ছি।

এবার গোপালের বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। বললেন, আজ্ঞে, ব্যূহভেদটা আগে হয়ে যাক।

বিমান আপত্তি করল না, খুব হাসতে লাগল। ততক্ষণে গোপাল শ্রীনাথের সঙ্গে শশব্যস্তে নিচে নামতে লেগেছেন। চেঁচিয়ে বললেন, ওরে মালা, তুই তবে গিন্নিমাদের সঙ্গে বসে শোনগে যা। ব্যূহভেদ হয়ে গেলেই মায়ে-পোয়ে বেরিয়ে পড়ব।

বিমান মৃদুকণ্ঠে বলল, ব্যূহভেদ হয়ে গেছে বলে ভরসা হচ্ছে, কি বলেন?

যান। বলে বনমালা রাগ করে মেয়েদের ওদিকে চলে গেল।

বিমানের মা বলছিলেন, মেয়েটি বড় খাসা। যেমন পটের মতো চেহারা, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা।

বিমান বলল, বড্ড ঝগড়া করে মা, তোমাদের সামনেই ভিজে বেরালটি।

মা হেসে বললেন, তোর সঙ্গে করেছে নাকি? তা হলে দেখেছিস তুই? তোর যা স্বভাব, ঝগড়াটে না হলে তোকে আঁটবে কে? কেমন লক্ষ্মীর মতো আমার পায়ের গোড়ায় বসেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখি।

বিমানের এত পশার-প্রতিপত্তি, মায়ের কাছে কিছুই খাটে না। সে চুপ করে রইল।

তারপর একটুখানি ভেবে মা বলতে লাগলেন, তবে আমাদের গোপাল খাজাঞ্চির ভাইঝি—এই একটা কথা। কর্তার সঙ্গে যতই থাক, তবু ঘোষ-মশায় এখানে চাকরি করেন। তাঁরই ভাইঝি কিনা—

এবার বিমানের কথা ফুটল।

তা যদি বল মা, তবে আমি কিছুতে শুনব না। হাত-মুখ নেড়ে সে মহাতর্ক শুরু করল।—বড়লোক, গরিব লোক, চাকর, মনিব—ওসব ভগবান করেন নি, মানুষে করেছে সমস্ত উঠে যাচ্ছে। রাশ্যা বলে দেশ আছে শুনেছ? সেখানে সব সমান—

মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে। গিন্নি কমল-করে ফর্দটুকে দিয়েছেন, কলকাতায় বাজার করতে যাচ্ছি।

ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়াতে তিনকড়ি ভূদেব প্রভৃতি মুখ বাড়িয়ে একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করল, এই যে পূর্ণ-দা', আসুন—আমরা এই গাড়িতে।

অর্থাৎ আমার আব কোন উদ্দেশ্য নেই—পকেটের ভিতর ঐ তিন পাতার ফর্দখানাও অলীক—প্লাটফরমের উপর ল্যাম্প-পোষ্ট ঠেশ দিয়ে আমি যেন কেবল এদেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

যাই হোক—তাকিয়ে দেখি, কামবায় ভিড় নেই। তিনকড়ি তাড়াতাড়ি কোঁচা দিয়ে বেঞ্চের ধুলা ঝেড়ে দিল। তারপব ধাঁ করে সেই কোঁচারই খানিকটা সামনাসামনি দুই বেঞ্চে পেতে তারককে বলল, ধর্ টেনে। একটা মিনিটও অকারণে ব্যয় করবাব লোক এরা নয়। তাবক ও-দিকে পা চেপে কাপড়ে টান রেখেছে, ভূদেব চক্ষেব পলকে পকেট থেকে তাস বেব কবে বার কতক ভেঁজে আমাকে দিল, কাটুন।

আমি বললাম, না।

তারক ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইল। তিনকড়ি রাগি মানুষ, কোঁচার কাপড় কোমরে গুঁজে ফেলল। ভূদেব তাস ভাঁজতে ভাঁজতে অতিশয় কাতর কণ্ঠে বলল, 'না' কেন দাদা? নইলে আবার একটা লোক পাই কোথা?

শরীর খারাপ। বলে পকেটের ফর্দ বের করলাম, এবং বাঁ হাতে মাথার রগ টিপে খানিকটা সরে গিয়ে বসলাম। মাথার অপরাধ নেই। পুরো তিনখানা পাতার মধ্যে এক ইঞ্চি জায়গা রেহাই পায় নি। কমল-কর এমন নিদারুণ রকম চালনা করলে মাথা ঘোরে না, এমন শক্তিশালী মাথা পৃথিবীতে ক-টা আছে?

কিন্তু তিনকড়ির করুণা নেই। সে রুখে উঠল।

থাক, থাক—তোর ঐ তাসজোড়া রেখে দে দিকি। লোকের কি অভাব? এই তো বারাসত ষ্টেশন এসে গেল, কত লোক উঠবে—

অতঃপর আর কি করা যায়, একদম বাইরে তাকিয়ে স্বভাবের শোভা দেখতে লাগলাম। চোখের সামনে কিন্তু বড়বাজার-রাধা-বাজারের সারবন্দি দোকানগুলো ভেসে উঠছে। ভাবতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। রাত্রি দশটা-একুশের ট্রেনে ছাড়া বাড়ি ফেরা যাবে না। তখনও যে মোটঘাটগুলো ফেলে একটু নিশ্বাস নেব, সে ভরসা নেই। গিন্নিকে আজ কুড়ি বছর দেখে আসছি। ফর্দে ভুল বেরুবে, পুনশ্চ কলকাতায় ছুটতে হবে, কতবার যে ছুটোছুটি করতে হবে তার সীমা-সংখ্যা নেই। বাজার করে আসি—বলে ক-দিন আগে সরকার মশাই গা-ঢাকা দিয়েছেন। ঐরকম সত্যভাষণ তাঁর পক্ষে নূতন নয়, গোড়ায় আশ্চর্য হই নি—কিন্তু পরে যখন হাতঘড়িটাও খুঁজে পেলাম না, তখন উদ্বেগ হল। কিন্তু সে যাই হোক, ভদ্রলোক এই দায়টা

কাটিয়ে দিয়ে যদি যেতেন, ঘড়ির শোক আমার মনে লাগত না। লোকের অভাব নেই—সেই থেকে অন্তত ডজনখানেক লোক চাকরিটার জন্য হাঁটাহাঁটি করছে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে বসেছি, না বলে পালায় না, বাজে কথা বলে না—খাঁটি লোক এমন কাউকে পাই তো রাখব, তা সে দু-পয়সা বেশি মাইনে নেয়, নিক—কিন্তু অমন করে আর ঠকব না, কক্ষনো না।

কোথায় গো, সে কদ্দুর?

অনেক, অনে-ক দূর—

তাকিয়ে দেখি অল্পবয়সি দুটি মেয়ে-পুরুষ। এদেরও রাধাবাজার অবধি সওদা আছে নাকি? পুরুষ লোকটির গায়ে ছেঁড়া জিনের কোট, তার উপর ধবধবে কোঁচানো চাদর। আর বউটির ডাগর-ডাগর চোখ দুটি। পায়ে সুন্দর করে আলতা পরেছে; আলতা-পা দুটি বেঞ্চের উপর এলিয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে বসে সে বরের কথা শুনছে।

হাত-মুখ ঘুরিয়ে লোকটি বলছে, সে বুঝি এখানে! তোমার দৌড় বারাসত অবধি তো? বারাসতের পর বিরিটি…তারপর অনেক —অনেক পরে কলকাতা। কলকাতা ছাড়িয়ে কদ্দুর গিয়ে তবে হলগে ঢাকা, দিল্লি, রাণীগঞ্জ…বরফ পড়ে সমস্ত একাকার…সেই যে ষ্টেশনে বরফ কিনে দিলাম, বুঝলে না?

বউ ঘাড় নাড়ে, সমস্ত সে বুঝেছে। বরফের দেশের গল্প শুনে আমিও তটস্থ হয়ে উঠলাম। বউ বলল, এই যত বরফ ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিক্রি হচ্ছে, সব বুঝি সেখান থেকে নিয়ে এসেছে! হি-হি-হি—আচ্ছা দেশ তো! বরফ কিনে খেতে হয় না।

স্বামী বলল, কিনবে কি দুঃখে! এখানে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে, সেখানে বরফ। হুড়-মুড় করে দশ-মনি বিশ-মনি সব বরফ পড়ছে।

বউ সভয়ে বলল, সর্বনাশ, যদি কারো ঘাড়ে পড়ে!

সে হবার জো নেই। মেঘ দেখলে সবাই দুয়োরে খিল দেয়। খোড়ো-বাড়ি নেই, সব দালান-কোঠা, কিছু ক্ষতি হয় না। বৃষ্টি থামলে সেই সব ববফ শেষকালে চালান হয়ে আসে।

প্রলুব্ধ ভাবে বউ বলল, বড্ড ভাল দেশ গো! আমি হলে একেবারে ঘটিখানেক খেয়ে ফেলতাম। পয়সা তো লাগত না—

ভীষণ গরম, গা দিয়ে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমারও মনে হল, বরফের দেশ রাণীগঞ্জে এই সময়টা যেতে পারলে মন্দ হত না। বউটি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। গাড়ি তীরবেগে ছুটেছে।

এই ফাঁকে পুরুষ-পুঙ্গবটির পরিচয় নিতে লোভ হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন আপনি?

আপাতত কলকাতা। তারপর কোথায় পাঠাবে, হেঁ-হেঁ,—সেইটে বলা মুশকিল। যেখানে কাজ আটকাবে, শর্মা সেখানে। তবে এবারে সাফ বলে রেখেছি, আর ঘোরাঘুরি নয়—রাণীগঞ্জ হেডআফিসের হেড-গোমস্তা হয়ে যাব।

আরও হত—কিন্তু এমনি সময়ে আঁচলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বউটি মুখ ফেরাল। চোখ রাঙা হয়ে জল পড়ছে, কিন্তু কি যেন মজার ব্যাপার—সে খিলখিল করে হাসে। স্বামী চোখের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করতে বউ তাকে ঠেলে দিল। বলে, ও কিছু না। কয়লার গুঁড়ো পড়েছিল, সে উড়ে গেছে কখন—কিচ্ছু নেই।

বড় বড় চোখ-দুটি মেলে হাসিমুখে বলে—আচ্ছা, ষ্টেশনে ঐ যে কয়লার গাদা দেখে এলাম। কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করেছে—এত কাঠ পায় কোথা?

তার বোকামিতে বিজ্ঞ স্বামী হেসেই খুন।

আ আমার কপাল! কাঠ পুড়িয়ে হয় বুঝি?

তবে?

মস্ত মস্ত কয়লার পাহাড় আছে।

বউ বলল, আমি তা জানব কি করে বল। তোমার মতো কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক করে বেড়াই নি তো!

স্বামী করুণা-পরবশ হয়ে তখন বোঝাতে লাগল, এই মস্ত মস্ত পাহাড়, তাতে খালি কয়লা। হাজার হাজার মানুষ কোদাল দিয়ে পাহাড় কেটে কয়লা আনছে।

বউ জিজ্ঞাসা করল, কয়লার পাহাড়ে বেড়ানো যায়?

স্বামী ঘাড় নাড়ল, খুব, খুব। কাপড় বড্ড ময়লা হয়ে যায়—এই যা। বউ টিপি-টিপি হাসছিল, একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, দেখ, এই ইয়ে···আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। একবার একটু দেখে আসব। ফিক করে হেসে বলল, কিন্তু কয়লার পাহাড়ে যাব না, বলে রাখছি। ও পোড়ার দেশে গিয়ে অত কাপড় কেচে মরবে কে? রাণীগঞ্জে নিয়ে যেও।

একটু থেমে আবার বলে, যাবার মুখে কয়লার দেশটাও না হয় একবার দেখে যাব—কি বল?

স্বামী তৎক্ষণাৎ সায় দেয়। নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমরা হলাম সাত ঘাটের জলখাওয়া মানুষ···হিল্লি-দিল্লি সমস্ত পায়ের তলায়। আর আমার স্ত্রী হয়ে···নিশ্চয় নিয়ে যাব। এই ক-টা মাস থাক গিয়ে বাপের

বাড়ি—তারপর রাণীগঞ্জে বাসা করব। পাহাড়ের উপর বাড়ি, গোরু-বাছুর, আম-কাঁঠাল, নারকেল-সুপারি—কোন কিছুর অভাব নেই।

বারাসাত ষ্টেশনে বউটির বাপের বাড়ির লোক গোরুর গাড়ির নিয়ে ছিল। সুদূর রাণীগঞ্জের পাহাড় এবং দশ-মনি বিশ-মনি বরফের কথা ভাবতে ভাবতে সে নেমে গেল। ইঞ্জিন জল নিচ্ছে। চাকার ধুলো উড়িয়ে গোরুর গাড়ি চলল।

এবার বিস্তারিত পরিচয়ের অবসর হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা হয় আপনার ?

কি করা হয় ? হেঁ-হেঁ, তা তো বটেই! তারপর লোকটি মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে চেয়ে বলল, চা-বাগানের খোঁজ-খবর রাখেন কি মশাই ?

ঘাড় নাড়লাম। লোকটি বলে, তবে আর চাই কি জানবেন ? একবার রমানাথ দত্তের নাম করে দেখুন গে। এক ডাকে সাড়া পড়ে যাবে। বিশ-পঁচিশটা বাগানের গোমস্তাগিরি করা হয়ে গেছে, এক-শ দেড়-শ সাহেব এই মুঠোর মধ্যে। আমি কাউকে কেয়ার করি না কি! দিন মশাই—ও কি সিগারেট নাকি ? দিন ও-ই একটা—

ধূমপান করে গোমস্তা মশায়ের উৎসাহ ভয়ানক রকম বেড়ে উঠল, চাকরির নানা কাহিনী সবিস্তারে বলতে লাগল। একবার বিনামেঘে বরফ পড়ে রাণীগঞ্জে এক-শ লোকের জীবন্ত কবর হয়েছিল, সেই সব অতি-ভয়ঙ্কর গল্প! বউ ভয় পেয়ে যাবে, তা হলে অতদূর তাকে যেতে দেবে না—তাই বউয়ের সামনে এসব গল্প করে না, আমাকে নিয়ে শুরু করেছে। বিষম মুশকিল। তিনকড়িরা ইতিমধ্যে লোক পেয়ে গেছে, যারা খেলছে তার অন্তত চতুর্গুণ দর্শক। সেখানে গিয়ে

মাথা ঢুকাব, সে জো নেই। এরই মধ্যে কখন যে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, চেঁচামেচিতে চোখ মেলে দেখি, শিয়ালদহ ষ্টেশন।

একটা গাড়ি ডেকে উঠতে যাচ্ছি, পিছন থেকে কাতর কণ্ঠের ডাক এল, শুন্‌ন মশাই—

আদ্যনাথ চক্রবর্তীর বাসাটা জানেন?

চেয়ে দেখি, একডাকে সাড়া-পড়ানো সেই রমানাথ দত্ত। বলল, এই ইয়ে···আদ্যনাথ চক্রবর্তীর বাসাটা জানেন? বড়-গঙ্গার কাছাকাছি কোন্ খানে—

বললাম, এত বড় শহরে কোথাকার আন্তনাথ—কে তাঁকে চেনে? কোন্ রাস্তা? নম্বর কত?

জবাব দেবে কি, দত্ত মশায়ের চক্ষু তখন কপালে উঠে গেছে। হাঁ করে চারিদিকের দালান-ইমারত দেখেছ। জিজ্ঞাসা করলাম, আর কখনো কলকাতায় এসো নি?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সে বলল, আজ্ঞে, না। চক্রবর্তী মশায় দেশে গেলে চাকরির কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, যেও—দেখা যাবে। কে জানে এখানে এত রাস্তা, আর এত নম্বর। তিনি কিছু বললেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি।

সামনের সিট দেখিয়ে দিলাম। উঠে এসো এখানে। বললাম, এই যে বলছিলে, চা-বাগানে গোমস্তাগিরি কর।

রমানাথ বলল, আজ্ঞে গোমস্তাই ছিলাম। চা-বাগানের নয়—ও একটুখানি ভুল কথা বলা হয়েছে—এক গাঁতিদারের গোমস্তা, ঐ বিরিটি ষ্টেশনের কাছে। সঙ্গে এক পাঠশালাও ছিল। সোনার চাকরি মশাই, পাঁচ-ছ টাকা মাসে পোষাত, কিন্তু কপালে সইল না।

দারুণ দুঃখে লোকটি চুপ করল। জিজ্ঞাসা করলাম, চাকরি গেল কেন?

সে আর কেন বলেন! গেল-বছর বিয়ে হল, তারপর এটা-সেটায় বুঝতেই পারছেন—ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বাবু বললেন, নেহি মাংতা—যাও।

বলতে বলতে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে, মশায় কি বিবাহিত?

নিশ্চয়।

তবে আর বলব কি, বুঝতে পারছেন। চাকরি নেই, নতুন

বউকে তা বলি নি। বললে কি আর পশার থাকে? বলুন না। আর হয়তো সবাই মিলে ওকেই দুষবে, ওর কপালে চাকরি গেছে। আমার শ্বশুরের অবস্থাও আবার তেমন সুবিধের নয়—

একটা বার ভাল করে ভেবে নিলাম। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসা ঠিক নয়। আজও গিন্নির সঙ্গে বচসা করে জোর গলায় বলে এসেছি, খাঁটি লোক যদি পাই, তবে রাখব; বাজে লোক রেখে বারম্বার লোকসান দিয়ে মরব না। অথচ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কবে যে আমার বাজার-সরকারি করতে আসছেন, জানি নে। রমানাথের আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিলাম। বউ কাছে নেই, অতএব পশার রাখারও প্রয়োজন নেই—এখন তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বললাম, চল আপাতত রাধাবাজার, সেখান থেকে হাওড়ার হাট। রাত্রে বাড়ি ফিরব। বাজার-সরকারি করতে পারবে তো? দশ টাকা মাইনে।

নিস্পন্দ পুতুলের মতো বসেছিল, তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো মুহূর্তে নড়ে উঠল। আমার হাত দু-খানাও যেন জড়িয়ে ধরবার জোগাড় করেছিল। কিন্তু ঐ মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণে হি-হি করে হেসে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখবেন। পারি কি না পারি, কাজ দিয়ে দেখুন একবার। আমরা বলে সাত-ঘাটের জল-খাওয়া লোক—ঐ রাধাবাজার কেষ্টবাজার—হেঁ-হেঁ সমস্ত শর্মার পায়ের তলায়—

মধুরেণ সমাপয়েৎ

ইলেকশন হয়ে গেছে। খবরের কাগজে আর মজা নেই—ফরাসের একপাশে পড়ে থাকে। সুরথের নজর পড়ল বিজ্ঞাপনের পাতার উপর।

আরও চার-পাঁচ জন ঝুঁকে পড়েছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে একবার পড়ল। তারপর সেই জায়গাটা ছিঁড়ে নিল।

মাধবেরও দৃষ্টি পড়েছে। তিনি একাদিক্রমে সাড়ে-চার বৎসর চাকরির দরখাস্ত পাঠাচ্ছেন। ইদানীং বিরক্ত হয়ে বেয়ারিং-পোস্টে পাঠিয়ে থাকেন। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কর্মখালি?

উঁহু—বলে সুরথ সশব্দে হাসতে শুরু করল।

এত স্ফূর্তি কিসের হে? দেখি, দেখি। আরও চার-পাঁচ জন ঝুঁকে পড়েছে।

সুরথ বিজ্ঞাপনটা দেখাল—

বধু-বিক্রয়

অতি চমৎকার। তাজা ও টাটকা।

নিশ্চয় পছন্দ হইবে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কামাখ্যা ভটচায সুরথের চশমাটা নিয়ে চোখে লাগালেন। অভি-নিবেশের সঙ্গে বার দুই পড়ে বললেন, ও, বানান গোলমাল করে ফেলেছে বলে হাসছ? হাসির কি আছে সুরথ-বাবাজি? আমাদের আমলে আট বছরের গৌরীরা আসতেন, বিশ বছর বউটি থেকে শেষে হতেন গিন্নি। এখনকার ধিঙ্গিরা বাসরঘরেই বরের চালচুলোর নিকেশ নিতে বসে যান। বধূরাই হ্রস্ব হয়ে গিয়েছেন, তা হ্রস্ব উ-কার কেন হবে না বাপু?

হরবিলাস ছোকরা-উকিল, আগাগোড়াই ঘাড় নাড়ছিল। গম্ভীর হয়ে বলল, শুধু বানান নয়, আইনেরও গোলমাল রয়েছে। মানুষ বিক্রি কি করে হতে পারে? সে তো বেআইনি।

পান্নালালের দল দাবায় মশগুল ছিল, তার মধ্যেও কথাটা কানে গেল। শৈশবে ইতিহাস পড়েছিল, পুরাণো স্বপ্নের মতো ভাসা-ভাসা তার একটু মনে এল। সে বলে উঠল, দাস-বিক্রি আইনে মানা। আমেরিকায় কত হৈ-চৈ হল। মানুষ-বিক্রি বেআইনি, এ কথা তো কই কোনদিন পড়ি নি—

ভটচায বললেন, তা হলেও ঐ একই কথা। দাস না হল, বধূ দাসী

ছাড়া আর কি। জান না, কনকাঞ্জলির সময় বলতে হয়, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি—

হরবিলাস সবেগে মাথা নাড়ল।

ও সব আগে হত ভটচায মশাই, এখন হয় না। এখন বললে মানহানির প্যাঁচে পড়ে যাবেন। পান্নালাল বলেছে ঠিক, আমেরিকায় হুলস্থুল হয়েছিল বটে! কিন্তু গোলমালটা হচ্ছে, আমেরিকার আইন এখানে খাটবে কিনা।

সুরথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি নিজে যাচ্ছি সব গোলমালের আস্কারা করতে।

ভটচায পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, কি হয় খবর দিও। আমরা চিন্তিত রইলাম।

ঠিকানা ছিল—৮৭-সি শ্যামলাল লেন। অনেক খুঁজে পেতে সুরথ গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। এক বুড়ো ভদ্রলোক দোর খুলে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

সুরথ বলল, 'বন্দেমাতরমে' বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই নাম হরিহর রায়।

বুড়া আর কিছু বলতে দিলেন না, চেঁচাতে শুরু করলেন, অমলা, ওরে অমলা—

যোল-সতের বছরের একটি তন্বী মেয়ে চঞ্চল পায়ে ছুটে এল। অপরিচিত যুবাকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। হরিহর বলতে লাগলেন, অমলা, এই ইনি এসেছেন। তুই যে বলছিলি, বিজ্ঞাপনে কিছু হবে না —তোকে বলি নি, বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। এই দেখ বেরুতে না বেরুতে খদ্দের আসতে আরম্ভ হয়েছে।

নিতান্ত সরল আপন-ভোলা মানুষ—সাদা দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন সৌম্য মুখখানা দেখলে বোঝা যায়, এ লোকের কাছে আপন-পর নেই। অমলা বাপের কথাবার্তায় অস্বস্তি বোধ করতে.লাগল। তার-পরে দুই-এক পা করে সরে পড়ল।

তুই যে বলেছিলি ,বিজ্ঞাপনে কিছু হবে না···

হরিহর ততক্ষণে সুরথের সামনে বেঞ্চিখানায় চেপে বসেছেন। বললেন, চাকরি করতাম। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল। এখন

সেরে গেছে অবিশ্যি—কিন্তু চাকরি আর হল না। বড় টানাটানির মধ্যে চলেছে—তাই বাপু, বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছি।

সুরথের ইচ্ছে হল, বলে, আজ্ঞে না, এখনও সারে নি। কিন্তু সত্যি সত্যি তো বলা যায় না। বুড়া মানুষটির দিকে চেয়ে তার দুঃখ হল। এতক্ষণে বোঝা গেল, গোলমাল আইনের নয়, বানানেরও নয়—এই লোকটির মাথার।

হরিহর বলতে লাগলেন, তা কিচ্ছু বাড়িয়ে লিখি নি বাবা। মাল একদম তাজা—যে দেখবে, তারই পছন্দ হবে। দেখাচ্ছি তোমাকে।

আবার চিৎকার শুরু হল, অমলা, অমলা!

ও-ঘর থেকে মিষ্টি গলার আওয়াজ এল, বার বার উঠতে পারি নে বাবা, আমি কুটনো কুটছি।

হরিহর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তা বললে হবে কেন মা? ভদ্রলোক এলেন এদ্দুর—

অমলা বলল, তাঁকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

সুরথ রীতিমত ঘাবড়ে গেল। মাথার গোলমাল মেয়েটারও নাকি? জানা নেই, শোনা নেই—বলে, পাঠিয়ে দাও।

দাঁড়িয়ে সে ইতস্তত করছে, হরিহর বললেন, যাও বাবা, সমস্ত দেখিয়ে দেবে—

ভিতরে গিয়ে দেখে, অমলা কুটনো কুটছে না, কিছু না, সমস্ত মিছে কথা—খাটের উপর পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। সুরথকে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল।

সর্বনাশ, মাথা এরও নিশ্চয় খারাপ!...কিন্তু হঠাৎ মনে হল, একে তো

সে চেনে। রাঙা-খুকি এখন কত বড় হয়েছে—এখন হয়ে গেছে অমলা। চেনাই দায়!

সুরথ বলল, বিনয় আজকাল—

মেয়েটির হাসিমুখ হঠাৎ আঁধার হয়ে গেল, উপরের দিকে হাত তুলে বলল, স্বর্গে।

একটুখানি চুপচাপ।

তারপর ম্লান হেসে অমলা বলতে লাগল, বাপরে বাপ, এই পাঁচ বচ্ছরে যেন পাঁচ যুগ চলে গেছে। মা গেলেন, দাদা গেলেন, বাবার মাথা খারাপ হল, চাকরি গেল। অনেক চিকিৎসা-পত্তোর হল, শেষে ডাক্তারের কথামতো আমরা সকলে পুরী গিয়ে রইলাম।

সুরথ একটু লজ্জিত হল। বিনয় তার সহপাঠী, তার সঙ্গে দু-চার বার এদের বাড়ি এসেছে। অমলাকেও দেখেছে, তখন এই মেয়েটার কে-ই বা খোঁজ রাখত, কে জানত সে বড় হবে, এমন সুন্দর হবে! অবশ্য এমন বিশেষ কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না যে অহরহ এদের খোঁজ রাখতে হবে, তবু সে কেমন অপ্রতিভ হয়ে উঠল। কৈফিয়তের সুরে বলল, আমিও মাঝে একটা চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাই কিনা···সেই মির্জাপুরের বাড়িটা তো বেশ ছিল। এটা বড্ড অন্ধকার।

অমলা বলল, সেটায় ভাড়াটে আছে। আমরা ফিরেছি মোটে মাসখানেক। কি কর্‌ব্বা যায়—এখানে এসে উঠতে হল।

তারপর অমলা অন্য কথা আরম্ভ করল।

আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। মীমাংসা ছেড়ে আজকাল মধুর কারবার ধরেছেন নাকি?

সুরথের লজ্জা হতে লাগল। বাস্তবিক বিজ্ঞাপন পড়ে এই রকম ছুটে আসা তার ঠিক হয় নি। আর ব্যাপারটা কিনা একেবারে

বিনয়দের বাড়িতেই। সেই রাঙা-খুকিটা এখন বড় হয়ে—অমলা হয়ে ঠাট্টা করতে লেগেছে। সুরথ সংস্কৃতের এম. এ. পাশ করে মীমাংসার উপর থিসিস লিখছিল। এরা সে খবর রাখে, ইঙ্গিতটা তারই।

কিন্তু ঠকবার ছেলে সুরথ নয়। বলল, শাস্ত্রেই রয়েছে, মধুরেণ সমাপয়েৎ। মধুর রসেই সকল মীমাংসা হওয়া উচিত। যাকগে—আমি এবার উঠব, অনেক কাজ আছে।

অমলা বলল, আপনাকে ভঁাড়ারে যেতে হবে। এখানে তো আনা যাবে না—

কেন ?

সুরথ পালাবার মতলবে ছিল, অমলার কথায় কৌতূহল আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

বা রে! সে কত বড় টিন। আমি বয়ে আনতে পারি ?

টিন ?

অমলা বলল, হঁ্যা, বড় বড় মধুর টিন। সুন্দরবনের চক থেকে মধু আসে। বাবা বললেন, বিক্রি করে দিলে হয় মন দশেক।

সুরথ বিজ্ঞাপনের টুকরা পকেট থেকে বের করল। তার নিজের চোখের গোলমাল হয় নি তো ? অমলা সেটা নিয়ে পড়ে দেখে হাততালি দিয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল।

কি সর্বনাশ! ছাপার ভুলে 'মধু'কে 'বধূ' করে ফেলেছে। আপনি তাহলে বুঝি বধূর খোঁজে এসেছেন!

সুরথ হাসল না, কি-একটা ভেবে নিয়ে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়ল। বলল, হঁ্যা।

দেখাদেখি অমলাও হাসি থামাল। বলল, তাই তো, মিছামিছি হয়রান হলেন।

সুরথ বলে, তাই কি বলা যায়? ঠকে যাওয়া আমার স্বভাব নয়: শুধু তুমি সহায় থেকো অমলা। দেখা যাক কি হয়।

ব্যস্তবাগীশ হরিহর এ ঘরে চলে এসেছেন। বললেন, চমৎকার জিনিস—নয়? বল। আমি কি মিছে কথা লিখেছি?

অমলা বলল, বাবা!

হরিহর বললেন, ভাল করে দেখিয়েছিস তো? দেখে পছন্দ করে নাও বাবা। তুমি আমার ছেলের বয়সি—শেষে বলবে বুড়ো ঠকিয়ে দিয়েছে।

সুরথ বলল, আজ্ঞে, বিজ্ঞাপনে ভুল রয়েছে।

ভুল? আমি যে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছি। বুড়া সুরথের হাত থেকে কাগজের টুকরোটি নিয়ে মনোযোগ করে পড়লেন। বললেন ঐ রে, ভুলই হয়ে গেছে। এক মনের কম বিক্রি হবে না, তা তো লেখা হয় নি। তুমি বাবা, দু-এক সেরের খদ্দের বুঝি? তা হোক গে—ওরে অমলা, আমাদের খাবার মধু থেকে দে না সের দেড়েক। ওর আর দাম দিতে হবে না। তুমি আমার ছেলের বয়সি, তোমায় দেখে বড় মমতা হচ্ছে।

সুরথ ভুলটা তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বুড়া হতোৎসাহ হয়ে পড়লেন।

ওঃ, তা হলে মধু চাও না মোটে? তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ওরে অমলা, সেই যে মধুর পায়েস করেছিলি, আছে না? তুমি বাবা আমার ছেলের মতো···কেমন যেন লাগছে।

হরিহরের কোটর-গত চোখ দুটো অশ্রুতে চক-চক করে উঠল।

সুরথ উঠে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বলল, আপনার ছেলেই হতে চাই।

ছেলেবয়সে বাবা মারা গেছেন। বিনয়ের সঙ্গে কতবার এসেছি, অমলাও জানে। এখন ইয়ে···আপনি যদি অনুমতি করেন, প্রায়ই আসতে পারব আমার বাড়িও দূরে নয়—

*　　　*　　　*

মাস দেড়েক পরে সুরথ আবার আড্ডায় এল। সকলে এক সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল।

প্রশান্ত বলল, কি হে, কোথায় ছিলে এদ্দিন? সেই যে বিজ্ঞাপনটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলে—বলি, আস্কারা হয়েছে কিছু? কিসের গোলমাল—আইনের না ব্যাকরণের?

সকলে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। সুরথ বলল, গোলমাল আগাগোড়াই। 'বধূ'র জায়গায় 'কনে' হবে, 'বিক্রয়ের' জায়গায় 'বিয়ে'।

ভটচায মাথা নেড়ে অনুমোদন করলেন, ঠিক ঠিক। বিয়ে হয়ে যাবার পর তো বধূ—তার আগে কনে। আর টাকা দেয় তো কন্যাপক্ষ, তারা বিক্রয় লেখে কোন হিসাবে? পাত্রপক্ষ বরঞ্চ লিখলেও লিখতে পারে। তারপর সমাধানটা কি রকম হল, সুরথ বাবাজি?

সুরথ ততক্ষণে পকেট থেকে এক গাদা নিমন্ত্রণ-পত্র বের করে বিলি করতে আরম্ভ করেছে।

এই লেখকের—

জল-জঙ্গল 'একখানি উপন্যাস। দুর্গম বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাদাবনের অধিবাসি-সুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব প্রবণ বিপরীতমুখী ঘটনাসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে, বিস্ময় ও ব্যাকুলতার আবেগে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ অবধি পড়িয়া যাইতে হয়, সমাপ্তিতে পৌছাইবার পূর্বে মধ্যপথে কোথাও থামিয়া দাঁড়াইবার ছেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সভ্য জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত এই জলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বিচিত্র লীলা দিবারাত্র অভিনীত হইতেছে, ছন্নছাড়া যে অপূর্ব জীবন-চাঞ্চল্য স্পন্দিত হইতেছে, তাহার আলোড়ন আমাদের গৃহপালিত পোষ-মানা নগর-জীবনের গাত্রে আসিয়া আহত হয় এবং মুহূর্তে সচেতন করিয়া তোলে বিচিত্র পটভূমিকায় হিল্লোলিত এমন এক উদ্দাম জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে—যাহার পরিচয় লেখকের নখদর্পণে, যাহার প্রতিচ্ছবি গ্রন্থটির পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে। স্কটল্যাণ্ডের জলাভূমি-অঞ্চলের বিচিত্র জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিলাতী নভেলের ইহা সমপর্যায়ে স্থাপিত হইবার যোগ্য। অচেনা ও অজানা রহস্য-রাজ্যের প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে আলোচ্য উপন্যাসখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত ও সম্বর্ধিত হইবে'—**আনন্দবাজার**। চার টাকা।

সৈনিক ৬ষ্ঠ সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে'—**যুগান্তর**। 'এই বইখানি একাধারে ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন'—**দেশ**। সাড়ে তিন টাকা।

বাঁশের কেল্লা ২য় সং। 'জাতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের গৌরবময় পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিকেব মধুক্ষরা লেখনীর মুখে নীলবিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগস্ট-বিপ্লবের অশ্রুসিক্ত অধ্যায়গুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।...মর্মচেরা আত্মদানের বিস্মৃত-প্রায় বিচিত্র কাহিনী, সংগ্রাম ও সংগঠনের ভুলে-যাওয়া ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতোই একে একে ছায়া ফেলিয়া যায় মনে। ইতিহাসের সেই ঝরাপাতা কুড়াইয়া সাহিত্যের রসে ভিজাইয়া লেখক জাতির জীবন-প্রবাহকে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন'—**যুগান্তর**। দুই টাকা চার আনা

ভুলি নাই ২২শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। দুই টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী ২য় সং। স্নিগ্ধ-মধুব প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দুই টাকা বারো আনা।

শত্রুপক্ষের মেয়ে ২য় সং। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ। খরস্রোত বসতিবিরল চরের উপর দুর্ধর্ষ মানুষের জীবনচিত্র। 'Sj. Monoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial stretches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times'—**অমৃতবাজার**। সাড়ে তিন টাকা।

আগষ্ট, ১৯৪২ ৩য় সং। আগস্ট বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। 'If the call given by the Congress in Bombay in August 1942 had electrified the nation, the movement or the peoples rebellion in which the reaction took shape had find the imagination of the artists. This is one of those things of beauty which inspired imagination and has since created for the entertainment and upliftment of men. Monoj Bose has cought the spirit of the August rebellion and have also added to it something of his own'—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। চারি টাকা।

যুগান্তর ২য় সং। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দুই টাকা।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় সং। বাছাই-করা গল্পের সংকলন। একখানি বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। লেখকের জীবন-কথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। পাঁচ টাকা।

খদ্যোত ২য় সং। 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুইই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়, রস চরম ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের—খদ্যোতের মিটিমিটি নহে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত ছোট করিয়া গল্প জমাইবার এই বিস্ময়কর কুশলতার প্রতিদ্বন্দ্বী-সংখ্যা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ। গল্পলেখক মনোজ বসুকে বুঝিতে হইলে এ বইখানি অবশ্যপাঠ্য'—যুগান্তর। দুই টাকা।

দুঃখ নিশার শেষে ৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল'—**শনিবারের চিঠি**। 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'—**অমৃতবাজার**। দুই টাকা।

উলু ২য় সং। 'যে কয়েকটি গল্প আছে তাহার অধিকাংশই মর্মান্তিক রূপে ট্রাজিক। মানুষের জীবনের বৃহত্তর ট্রাজেডি যাহা সদরে ঘটিয়া থাকে তাহা আমাদের মনে বেদনা জাগায়, কিন্তু ছোটখাটো ট্রাজেডি যাহা একটি অখ্যাত মানুষকে বা তাহার পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে, তাহার রূপ আমাদিগকে অভিভূত করে। উলু এই রকম অভিভূত-করা ট্রাজেডি গল্প। মনোজবাবুর গল্পের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে বইখানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইবে'—যুগান্তর। দুই টাকা চারি আনা।

কাচের আকাশ 'গল্প বলায় মনোজবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পুস্তকের সব গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু 'হাত মিষ্টি' সবার ভাগ্যে হয় না। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা কম লেখকের আছে'—দেশ। দুই টাকা।

দেবী কিশোরী ২য় সং বেরিয়েছে। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দুই টাকা।

নরবাঁধ ৪র্থ সং। 'একালের আরেকজন শক্তিমান কথা-শিল্পী শ্রী যুক্ত মনোজ বসু—তাঁহার 'মাথুর' নামক বড় গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব অনুযায়ী তেমনই কাব্য-রসে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই সেই বৈষ্ণব ভাব-সম্মেলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর, তেমনই নির্ম্মল। কোন ভয় নাই; অকল্যাণের অভিশাপ নাই।...বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েক জন দাবী করিতে পারেন'—**মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্গদর্শন**। দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is departure in the fiction literature of the Province'—**অমৃতবাজার**। দেড় টাকা।

বনমর্ম্মর ৪র্থ সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্যায়ে গিয়া পৌছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে,—**পরিচয়**। 'পাড়াগাঁয়ের নদী-মাঠ-বনের ছবি প্রবাসী বাঙালীকে homesick করে তুলবে'—**প্রবাসী**। 'সরল অকৃত্রিম অনাড়ম্বর জীবনের অতি-সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে—**বিচিত্রা**। আড়াই টাকা।

প্লাবন ৪র্থ সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপি-চাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—**যুগান্তর**। দেড় টাকা।

রাখিবন্ধন 'নূতন প্রভাত'-স্রষ্টার অগ্নি-ক্ষরা নবীন নাট্যসৃষ্টি। 'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসক-গোষ্ঠির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকেই মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্দোলনের গতিপথে উদয়াচলে নব সূর্যোদয়ের যুগান্তকারী ঘটনাকেও এই নাটকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন পদলেহীদের ভোল-পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপরূপ বিন্যাস নাটকখানিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সময়ের ব্যবধানে দুইখানি নাটককে একই নাটকে গ্রথিত করিবার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। কুমুদ, সুশীল, আজিজ, উমা, প্রিয়নাথ, ভবদেব, যজ্ঞেশ্বর, টমসন প্রমুখ চেনা-মুখগুলি তাজা ফুলের হাসির মতই চোখের উপর ভাসিতে থাকে।'—**যুগান্তর**। দেড টাকা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। 'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহাব সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর। ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—**আনন্দবাজার**। দুই টাকা।

নূতন প্রভাত ৪র্থ সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—**সুনীতি চট্টোপাধ্যায়**। 'মনোজ বাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়'—**অহীন্দ্র চৌধুরী**। 'এই ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি'—**নরেশ মিত্র**। 'আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে'—**নির্মলেন্দু লাহিড়ী**। দেড় টাড়া।